চড়াইডিহর শালুকফুল

এবং

হোরিয়ালি

বুদ্ধদেব গুহ

লেখাপড়া। কলকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ : কার্তিক ১৩৫৭

প্রকাশক : রাখাল সেন

লেখাপড়া : ১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-১২

মুদ্রাকর : পরাণচন্দ্র ঘোষ

পরাণ প্রেস : ৯৯এ, তারক প্রামাণিক রোড, কলকাতা-৬

প্রচ্ছদশিল্পী : পূর্ণেন্দু পত্রী

লেখকের অন্যান্য বই

ভাবার সময়
তিনটি উপন্যাস
ঋভু (১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ)
দশম প্রবাস
স্বপনে, নিভৃত স্বপনে
(স্বপ্নিল, পরিক্রমা, দ্রিমি)
সাঁঝবেলাতে
পর্ণমোচী
চরৈবেতি
যুগল উপন্যাস
তেরোটি উপন্যাস (একত্র সংকলন)
সমুদ্রমেখলা
সারেং মিঞা
শালডুংরি
জঙ্গল সম্ভার
অদল বদল
ভাল লাগে না
অজগরের দেশে
আলোকঝারি
পরদেশিয়া
কাঙ্গপোকপি
চানঘরে গান
অভিলাষ
সাজঘরে, একা
প্রেমের গল্প
ধুলোবালি
রিয়া
পঞ্চপ্রদীপ
কোজাগর
ইলমোরাণদের দেশে
পলাশতলীর পড়শী
নাজাই
যাওয়া আসা
লালা মিঞার শায়েরী
মহুড়া
পারিধী
সোপর্দ
বনবাসর
প্রথম প্রবাস
পঞ্চম প্রবাস
চবুতরা
প্রথমাদের জন্য
স্বগতোক্তি
লবঙ্গীর জঙ্গলে
জলছবি
অনুমতির জন্যে
আয়নার সামনে
জঙ্গল মহল
ঝাঁকিদর্শন
সুখের কাছে
জঙ্গলের জার্নাল
বাজা তোরা, রাজা যায়
দূরের দুপুর
চাপরাশ
সারস্বত
শ্রেষ্ঠ গল্প

চড়াইডিহির শালুকফুল

জবা ও শিবায়ন ঘোষকে



বড়মামিমা বললেন, একটু পরেই সন্ধে হয়ে যাবে। কোথায় বেরুচ্ছিস তপু এখন?

—'হলুদ বাড়িতে' যাব বড়মামি। হনসোদিদি বলছিল, জোজোমামারা এসেছেন নাকি গত রাতেই। পুজো কাটিয়ে যাবেন। লক্ষ্মীপুজোও কাটাবেন এখানেই।

—হ্যাঁ। ওদের আসার কথা ঘেটোও আমাকে বলেছিল বটে। ঘেটোর ছোট ভাই নেটো, নেটো তো ওদের বাড়ির অ্যাসিস্ট্যান্ট মালি। আর হেড মালি বসন্ত নাকি স্টেশনে গেছিল কাল বিকেলে জোজোদের আনতে। কিন্তু ট্রেনে করে আসেইনি। জোজোর স্করপিও গাড়িতে করেই এসেছে সোজা কলকাতা থেকে। বহুদিন পরে এল ওরা। তবে 'ওরা' বলতে তো শুধু দুজন।

—দুজন কেন?

—জোজোর স্ত্রী কেটি তো তিনবছর আগেই চলে গেছে। ও হাইলি ডায়াবেটিক ছিল।

—হার্ট অ্যাটাকে গেলেন? ঘুমের মধ্যেই? তাহলে তো কোনওই কষ্ট পাননি। শুনি, ডায়াবেটিকরা হার্ট অ্যাটাক হলে কষ্ট বুঝতে পারেন না।

—না না, হার্ট অ্যাটাকে মারা যায়নি কেটি। দু বছর রেগুলার ডাইলিসিস চলছিল। কিডনির প্রবলেম ছিল। তাতেই...

—জোজোর ছোট মেয়ে পুপু। বড় ছেলে আর বড় মেয়ে তো স্টেটস-এই পড়াশোনা করে তারপর সেখানেই সেটল করেছে। একেবারে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। একজন আমেরিকান মেয়ে বিয়ে করেছে, অন্য জন ইতালিয়ান ছেলে। কাজের সময়েও আসার সময় পায়নি। একজন হলিডেতে গেছিল বাহামাতে অন্য জনের অফিসে সাংঘাতিক জরুরি কাজ ছিল। একটা প্রেজেন্টেশন জাপানিজ ক্লায়েন্ট এর সামনে ওর বিদেশিনী শাশুড়িও অসুস্থ ছিলেন।

—তাই?

—মনে হল, বড়মামিমার গলাতে এই সব বলার সময়ে একটু শ্লেষ ঝরল।

তারপর বললেন, তা, তোর এই জঙ্গুলে জায়গাতে রাতের বেলা যাওয়ার কী দরকার? কাল সকালে গেলেই তো পারতিস? এসেছিস তো মোটে গতকাল। তা ছাড়া তুই তো আর এখানে থাকিস না। পাহাড়ী জায়গার কাঁচা রাস্তাতে কোথায় খানা কোথায় খন্দ তা কি তুই জানিস? আসছিসও তো পাঁচ পাঁচটা বছর পরে।

বললাম, টর্চ নিয়ে তো যাব। তাছাড়া, আজ তো চতুর্থী। শুক্লপক্ষর চাঁদ তো উঠবে তাড়াতাড়িই। বম্বে-কলকাতাতে থেকে থেকে প্রকৃতির সঙ্গে সমস্ত সম্পর্কই তো প্রায় ছিন্ন হতে বসেছে। তবে বম্বে-হাইতে থাকায় সমুদ্রর সঙ্গে ভাব হয়েছে বেশ। তাই তো মা-বাবার সঙ্গে কুয়ালালামপুরে না গিয়ে তোমার কাছে চলে এলাম বড়মামি। আর দুদিন বাদেই তো ষষ্ঠী। অথচ হৈ-হট্টগোল নেই, পুজোর প্যান্ডেলে ফুটপাথ ঘেরা নেই। গড়িয়াহাট কি শ্যামবাজার দিয়ে তো বছরের এই সময়ে হাঁটারই উপায় নেই। তোমাদের এখানকার সেই চিড়িয়াটোংড়ির পুজোটা হয় তো এখনও?

—হয়। সেখানেই তো অষ্টমীর দিনে অঞ্জলি দিই।

—শুধুই অষ্টমীর দিন কেন?

—হাঁটু। হাঁটুর জন্যে। এখন তো আর গাড়ি নেই।

—গাড়ি তো তুমি ইচ্ছে করে ফট্‌কেকে দান করে দিলে।

—ও ছেলেমানুষ, খুব বেড়াতে ভালবাসে। বেরিয়ে এসে আমাকে গল্প করে। এখানে গাড়ির দরকারই বা কী? গরুর গাড়িতেই তো দিব্যি কাজ চলে যায়। বুঝলি তপু, প্রয়োজন বাড়ালেই বাড়ে।

চারদিকে অপ্রয়োজনীয় প্রয়োজনের ভারে চাপা প'ড়ে থাকা এত লোক দেখি যে প্রয়োজন আর একেবারেই বাড়াব না ঠিক করেছি।

তারপরে বললেন, তুই একটা পাগল তপু। কুয়ালালামপুরে না গিয়ে কেউ জঙ্গলের মধ্যের ঝড়খন্ড আর ওড়িশার সীমান্তের এই অখ্যাত চড়াইডিহতে পুজোর ছুটি কাটাতে আসে।

—জায়গার খ্যাতি-অখ্যাতি দিয়ে কী করব আমি। জায়গাটা ভারি ভাল লাগে আমার। শান্ত, নির্জন, জঙ্গল আর পাহাড় ঘেরা। বড়মামা চলে যাওয়ার পরে কলকাতাতে না থেকে তুমি যে এখানেই থাকা মনস্থ করেছ তাতে তোমার আয়ু বেড়ে যাবে।

—এখানে তো কোনও টেনশন নেই, আওয়াজ নেই, ধুলো-ধোঁয়া নেই। তবে জীবনের কোনও উদ্দেশ্য না থাকলে বাড়তি আয়ু একটা বোঝা। ক্ষমতা থাকলে আমার আয়ু আমি তোকে দিয়ে যেতাম।

—একটু চুপ করে থেকে আমি বললাম, এর আগে মাত্র একবারই তো এসেছিলাম। তাও পুরো পাঁচ বছর হয়ে গেছে। এম.এস-সি. পরীক্ষা দিয়ে এসেছিলাম। জানো বড়মামিমা, এখনও যেন চড়াইডিহর ঘোর লেগে আছে চোখে।

—বড়মামিমা মৃন্ময়ী বললেন, পাঁচ বছর অনেকই সময়। পাঁচ বছরে যে কোনও জায়গা বা মানুষ অনেকই বদলে যায়। এতটাই বদলে যায় যে, চেনা পর্যন্ত যায় না।

—সেবারেও জোজোমামারা এসেছিলেন। তবে তাঁদের ছোট মেয়ে, কী যেন নাম বললে, পুপু না কী, সে আসেনি। ওঁরা দুজনেই শুধু এসেছিলেন।

—পুপু আসবে কী করে তখন। ও তো দিল্লির কোনও নামী রেসিডেনসিয়াল স্কুলে পড়ত। স্কুলটার নাম ভুলে গেছি। তখন ওর ছুটি ছিল না। তাছাড়া, শুনেছিলাম, সামনেই ওর স্কুল-লিভিংয়ের পরীক্ষাও ছিল।

—ও।

আমি বলাম।

তারপর বললাম, যাই। ঘুরে আসি।

—যদি যাসই তবে আর দেরি করিস না। আর জোজোকে বলিস আমার বাড়িতে যেন তাড়াতাড়ি আসে দু-একদিনের মধ্যেই। গত পাঁচ বছর অবশ্য প্রতি বছরেই বিজয়াতে চিঠি লিখেছিল জোজো একটা করে।

—বলো কি মামিমা? এই মোবাইল ই-মেইল-এর দিনে বিজয়ার চিঠি! আনথিংকেবল।

তা ঠিক। তবে জোজো লিখেছিল। প্রতি বছরেই লেখে। আমাদের জেনারেশানের মানুষেরা চিঠি লেখার অভ্যেস এখনও রেখেছে। গিরিডিতে যখন ওর বাবা এবং আমার বাবাও থাকতেন তখন আমাদের উপরে ব্রাহ্মপ্রভাব খুব বেশি করেই পড়েছিল। যদিও আমরা বা ওরা কেউই ব্রাহ্ম ছিলাম না। হিন্দুদের মধ্যে যাঁরা উচ্চশিক্ষিত, আধুনিক চিন্তা-ভাবনাতে পশ্চিমি-ভাবাপন্ন, তাঁরাই তো তখনকার দিনে ব্রাহ্ম হতেন বেশি। ব্রাহ্ম মাত্রই কিন্তু বাঙালিয়ানাতেও বিশ্বাস করতেন। ইংরেজি জানার সঙ্গে যে বাঙালিয়ানার কোনও ঝগড়া নেই তা ওঁদের দেখে বোঝা যেত। আমরাও ওঁদেরই মতো ছিলাম।

—তুমি বলছ বটে তবে সব ব্রাহ্মরাই যে ঠাকুর পরিবারের মতো ছিলেন এমন আমার মনে হয় না। ওদের মধ্যে অনেকেরই সাহেব সাহেব ভাব। কারো মৃত্যু উপলক্ষে উপাসনার সময়ও তাদের মধ্যে অধিকাংশই ইংরেজিতে স্মৃতিচারণ করেন। ওটা আমার ভীষণই দৃষ্টিকটু লাগে।

সত্যি! আজকাল ইংরেজি-জানা ছেলেমেয়েরা বাঙালিয়ানাকে একেবারেই বর্জন করেছে। এটা এক ধরনের অশিক্ষা, এক ধরনের গভীর হীনম্মন্যতা বলেই মনে হয় আমার।

—তুই তোরই মতো। আজকালকার অধিকাংশ ছেলেমেয়েই অন্যরকম। মাঝে মাঝে মনে হয়, আমরা যেন অন্য গ্রহের জীব। এদের যেন আমরা চিনিই না। ওরাও চেনে না আমাদের।

—তুমি যাবে জোজোমামাদের ওখানে? যাবে, তো চলো আমার সঙ্গে।

—আমি তো হাঁটুর ব্যথাতে কোথাওই যেতে পারি না। আজকাল গেলে, লাঠি লাগে। আর লাঠি নেওয়ার মতো বুড়ি তো আমি এখনও হইনি। লাঠি ঠক্‌ঠক করে তাই কোথাওই যেতে ইচ্ছে করে না। জোজোকে বলিস আমার কথা।

—ঠিক আছে, বলব।

—তারপর তপু বলল, এতদিন পরে জোজোমামা আমাকে চিনতে পারবেন তো?

—অবশ্যই পারবে। আজকে জোজো মস্ত বড় লোক হয়েছে কিন্তু তার যৌবনে তোর বাবার কাছে থেকে যে সাহায্য সে পেয়েছে তা না পেলে সে ভেসে যেত।

—তারপরই বললেন, জোজো বড়লোক হলেও অন্য অনেক বড়লোকের মতো অমানুষ নয়। বরং কেটিরই একটু দেমাক ছিল। তবে আমার কাছে আর কী দেমাক দেখাবে! ঈশ্বরের দয়াতে আর তোর বড়মামার দূরদৃষ্টিতে আমি তো কারও দেমাকের পরোয়া করিনি কোনওদিন। আজও করি না। আমার কাছে দেমাক দেখায় না তবে অন্য অনেকের কাছে শুনেছি, বিশেষ করে যাদের আর্থিক অবস্থা ভাল না তাদের কাছে দেখাত। যাক গে যাক, চলে যাওয়া মানুষের নিন্দে করতে নেই।

—তপু মনে মনে একটু বিরক্ত হল। মেয়েরা যতই উচ্চশিক্ষিত ও উদার হোন না কেন, মনে হয়, কিছু মেয়েলিপনা তাঁদের মধ্যে থেকেই যায়। এটা ওঁদের মুখের উপরে বলা যায় না বটে কিন্তু তপু তার বড়মামিমারই মতো একাধিক মহিলার মধ্যেই এই মেয়েলিপনা দেখেছে। তবে এটা শুধু মেয়েদের মধ্যে নয়, অনেক পুরুষের মধ্যেও লক্ষ্য করেছে। তাঁরা হয়তো ঠিক পুরুষ নন, তাঁদের বলা যায় মেয়েলি-পুরুষ।

—স্থানীয় মানুষদের মুখে মুখে জোজোমামার বাড়ির নাম যদিও 'হলুদ বাড়ি' আসলে মালিকের দেওয়া নামটি 'দ্য রিট্রিট'। বাঙালিরা একসময় যেখানেই বাইরে বাড়ি করতেন, তাঁদের অনেক বাড়ির নামই রাখা হত 'দ্য রিট্রিট'। সাহেবি কায়দাতে। সে বাড়ি গিরিডি, মধুপুর, শিমুলতলা, ঘাটশিলা বা হাজারিবাগ যেখানেই হোক না কেন। নাম 'দ্য রিট্রিট' হলেও শুধু চড়াইডিহরই নয়, আশেপাশের সব গ্রামের মানুষই এই বাড়িকে 'হলুদ বাড়ি' বলেই চেনে। সে বাড়ির বাইরের রঙই যে হলুদ তাই-ই নয়, তার দরজা-জানলা সব কিছুর রঙই হলুদ। পাঁচ বছর অগে তাই দেখেছে অন্তত। সব ঘরের জানলার পেলমেট থেকে হলুদ-রঙা পর্দা ঝোলে। বাগানে যে আধলা ইট দিয়ে কেয়ারি করা আছে তাতেও সাদা নয়, হলুদ রং। এই তল্লাটে একমাত্র এ বাড়িতেই জেনারেটর আছে। লোডশেডিং এর সময়ে আলো তীব্রতর হয়ে জ্বলে। এ বাড়ির শোবার ঘরে এয়ার-কন্ডিশনারও আছে। জোজোমামা আরামি। সেন্ সাহেব নাকি আগে আরও আরামি ছিলেন, লোকে বলে।

বড়মামির বাড়ি থেকে সিকিমাইল মতো পথ। লালমাটির পথ। দুপাশে গাছগাছালি ঝুপড়ি হয়ে আছে। শরৎকালে গাছেদের গা থেকে এক আশ্চর্য মিষ্টি গন্ধ বেরোয়। কারও বাড়ির হাতাতে শিউলি গাছে শিউলি ফুটেছে

অজস্র। সারা রাত টুপ-টাপ করে ফুল ঝরিয়ে সকালে কমলা আর সাদা রঙা গালচে বিছিয়ে দেয় প্রকৃতি। মাথার উপর দিয়ে ঝুপ-ঝুপ আওয়াজ করে নতুন অন্ধকারে দুটি বাদুড় উড়ে গেল। শিশির পড়া শুরু হয়েছে কিন্তু বোঝা যায় না। নিঃশব্দে পড়ে। গাছের পাতায়, পথের ঘাসে, পাতাগুলো সব ভিজে গেল তা থেকে টুপটাপ করে বৃষ্টির মতো পড়তে থাকবে। শিশিরেরও ভারী মিষ্টি গন্ধ আছে একটা, যা তার নিজস্ব। আকাশ তারা ভরা। তারা ছাড়াও মানুষের তৈরি নানা উপগ্রহও তারারই মতো উজ্জ্বল হয়ে আকাশে ঘোরে। সেই সব উপগ্রহ নানা স্বাভাবিক গ্রহ-নক্ষত্রর চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি প্রদক্ষিণ করে পৃথিবীকে এবং অনেক কাছেও থাকে।

শুক্লা চতুর্থীর হালকা চাল-ধোওয়া জলের মতো জ্যোৎস্নাতে ভেসে যাচ্ছে চড়াইডিহ। মাঠ, প্রান্তর, জঙ্গল-টাঁড় একটু দূরেই পাহাড়। পাহাড় না বলে টিলা বলাই ভাল। তাতে আদিবাসীদের একটি ছোট গ্রাম আছে। কী আদিবাসী তা জানে না তপু। জানা উচিত ছিল। শিক্ষিত-অশিক্ষিতের মধ্যে তফাত রচনা করে ঔৎসুক্যই। যার ঔৎসুক্য নেই, সে অশিক্ষিত। তবে তীব্র ঔৎসুক্য থাকা মানুষও যখন বুড়ো হন তখন তাঁর সেই ঔৎসুক্য স্তিমিত হয়ে আসে অধিকাংশর বেলাতেই। ঔৎসুক্য যাঁর মরে গেছে, ধরে নেওয়া যায় যে তাঁর যৌবনও অপগত হয়েছে।

দূর থেকে 'হলুদ বাড়ির' গেটটা দেখা যাচ্ছে। গেটের দু পাশের পিলারের উপরে দুটি গোল হলুদ ডোম-এর আলো জ্বলছে। তপুর মনে আছে পাঁচ বছর আগেও ওই আলো দুটিকে দেখেছিল। তবে গেটের ওই আলো তখনই জ্বলে যখন ওঁরা চড়াইডিহতে থাকেন। অন্য সময়ে বাগান ও বাংলোর হাতা পেরিয়ে গিয়ে বাইরের চওড়া বারান্দাতে একটি মাত্র আলো জ্বলে। পেছনে ও দু পাশেও জ্বলে সারারাত। শুনেছিল একটি করে গতবারে।

'হলুদ বাড়িতে' একজন কেয়ারটেকার এবং দুজন মালী থাকে। তাদের কোয়ার্টার বাগানের দুদিকে। কোয়ারটেকারের নাম ভুলে গেছে তপু কিন্তু এটা মনে আছে যে সেই বাঙালি ভদ্রলোক সম্ভবত ক্লাস এইট-নাইন অবধি পড়েছেন। ইংরেজি ও বাংলা লিখতে পড়তে পারেন। জোজোমামাদের অনুপস্থিতিতে উনিই বাড়ির ও বাগানের দেখভাল করেন। ফলসার সময়ে ফলসা, আমলকির সময়ে আমলকি, আমের সময়ে আম ঝুড়ি করে কলকাতাতে নিয়ে যান। হয় অনেক রকমেরই ফল, কিন্তু বাগান ইজারা

দেওয়া আছে। ওঁদের মস্ত বড় বাগান। প্রায় পনেরো বিঘা মতো। বড়মামির বাড়ির হাতাও প্রায় কুড়ি বিঘার মতো ইজারাদারেরাই ফল নিয়ে যায়। সে বাবদে যে টাকা আদায় হয় তাতেই কেয়ারটেকার ও মালীদের মাইনে উঠে আসে। কিছু হয়তো ঘাটতি পড়ে। সে টাকা প্রতি মাসে জোজোমামা মানি অর্ডার করে পাঠিয়ে দিতেন আগে।

বড়মামিমা বলছিলেন, বছর দুই হল জোজোমামা বড়মামিমার কাছেই থোক টাকা দিয়ে যান। বড়মামিমা একা থাকেন, তার উপরে জঙ্গুলে জায়গা, তাই ক্যাশ টাকা রাখতে নিমরাজি ছিলেন, বলেছিলেন, তোমার ওই টাকার জন্যেই আমার বাড়িতে ডাকাতি হবে কোনওদিন—আমাকে কেটে রেখে যাবে।

জোজোমামা নাকি বলেছিলেন, হারীতদা এই চড়াইডিহর মানুষদের জন্যে যা করেছেন তারপরে যদি তারা তোমার সঙ্গে এমন বেইমানি করে তবে মনুষ্যত্ব বলে আর কী থাকবে? পুকুর কেটে দেওয়া, রাস্তা বানিয়ে দেওয়া, কুয়ো খুঁড়ে দেওয়া, স্কুল ও হেল্‌থ সেন্টার বানিয়ে দেওয়া, কি না করেছেন হারীতদা এদের জন্য? যে ট্রাস্ট বানিয়ে গেছেন তার আয় থেকেই তো এসবের খরচ এখনও চলে। এখানকার কোন মানুযে তা না জানে!

বড়মামিমা বলেছিলেন, সবই ঠিক বলছ জোজো কিন্তু মানুষের মনুষ্যত্ব কি আছে আর? লেখাপড়া জানা শহুরে মানুযেরাই অমানুষ হয়ে গেল তো এই অশিক্ষিত গ্রামীণ মানুষদের দোষ দিয়ে লাভ কী?. তাছাড়া তোমার হারীতদার এই বদান্যতা নানা পার্টি ভাল চোখে দেখে না। এতে যে তাদের মোড়লি করার অসুবিধা হয়। কৃতিত্ব সব হারীতদার নামে জমা হয়। কোনও পার্টিই তো মানুযের ভাল চায় না, তাদেরই ভাল চায়, নিজেদের বাক্সে ভোট চায়।

তা অবশ্য ঠিক। তবে তোমার উপরে হামলা করার সাহস কারোই হবে না।

তারপরে জোজোমামা নাকি বলেছিলেন, এরা তেমন শিক্ষিত নয় বলেই এখনও মানুষ আছে বৌদি। তোমার কোনও ভয় নেই। তোমার জীবদ্দশাতে এরা কখনওই তোমার সঙ্গে কোনও খারাপ ব্যবহার করবে না।

বড়মামিমা বলেছিলেন, জানি না। নিজের পেটের ছেলেমেয়েরাই যদি অবহেলে ত্যাগ করতে পারে তা হলে এদের দোষ দেব কী করে।

জোজোমামা নাকি বলেছিলেন, ত্যাগ আর কোথায় করল। ওরা বিদেশে কাজের মধ্যে থাকে। পনেরো দিনের ছুটি পায় মোটে—কোথাও হলিডেতে যায়। পশ্চিমী দেশের জীবন তো আমাদের দেশের মতো ঢিলেঢালা নয়। কাজই ওদের কাছে সব।

বড়মামিমা বলেছিলেন, জানি না জোজো। ওদের কথা ওরাই জানে। আমার মরার সময়ে মুখে জল এই শালুকফুল আর হনসোরাই দেবে। জানি না, এই শ্মশান জাগিয়ে একা একা আর কতদিন বেঁচে থাকব? তোরা অল্পদিনের জন্যে আসিস। তাই তোদের এত ভাল লাগে। আমার মতো যারা সারা বছর থাকে তাদের একঘেয়ে লাগতে বাধ্য। যদি কেউ সুইজারল্যান্ডে থাকে তারও হয়তো তাই-ই লাগে।

ছেলেমেয়ের কাছে মাঝে মাঝে গেলেই পারেন।

গেছি তো তিন-চারবার। ও দেশের জীবনযাত্রা আমার ভাল লাগে না। বড় পরাধীন লাগে।



সাত সকালে নানান পাখির কিচিরমিচিরের মধ্যে ঘুম ভাঙল তপুর। গত রাতে ঘুমোতে ঘুমোতে অনেক দেরি হয়ে গেছিল। একটা বই পড়তে পড়তেই অমন হয়ে গেছিল। খাওয়ার টেবিলে বসেও নানা গল্প করতে করতে এবং বড়মামিমার গল্প শুনতে শুনতে অনেক রাত হয়েছিল।

বড়মামিমা বেশ অভিমানী হয়ে উঠেছেন। আমি যদি না আসতাম তাহলে বড়মামিমা পুজোর মধ্যে একলাই থাকতেন। অবশ্য জোজোমামারা এসেছেন। তবে জোজোমামাও তো একাই—মানে বিপত্নীক। একজন ভারতীয় মহিলা অন্যজনের সঙ্গে যে সব গল্প করতে পারেন তা একজন পুরুষের সঙ্গে পারেন না। আজও পারেন না। আমি এসে মামিমার সেই শূন্যতা পূরণ করতে পারিনি। তবে এবারে চড়াইডিহতে এসে দেখছি যে হনসো আর শালুকফুলই এখন বড়মামিমার সঙ্গী এবং সাথী। হনসোকে গতবারে এসেও দেখেছিল। হনসোর বয়স পঞ্চাশের প্রথম দিকে। তার স্বামী আছে। মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। ছেলে সেরাইকেলাতে কী একটা কাজ করে। স্বামী মাইল তিনেক দূরের গ্রামে চাষবাস নিয়ে থাকে। সেখানে বড়মামিমারও চাষের জমি আছে। হনসোর স্বামী সপ্তাহান্তে চড়াইডিহতে এসে হনসোর কোয়ার্টারে থাকে বড়মামিমার অতিথি হিসেবে। ওদের এক মেয়ে। বিয়ে হয়ে টাটার কাছের আদিত্যপুরে চলে গেছে। জামাই সেখানেই

কারখানাতে কাজ করে। বড়মামি বা তাঁর অতিথিদের গরুর গাড়ির দরকার হলে হনসোর মরদই বলদ জুতে গাড়ি নিয়ে চলে আসে। তপুকে সেইই ফুলকুঁড়ি স্টেশন থেকে নিয়ে এসেছিল কাল সকালে। আগে আগে দেখেছে যে ফুলকুঁড়ি স্টেশন থেকে একটা বাসও আসত চড়াইডিহতে কিন্তু আজকাল ডিজেলের দাম বেড়ে যাওয়াতে ভাড়াও বেড়ে গেছে বলে সেই বাস সার্ভিস বন্ধ হয়ে রয়েছে। এই অঞ্চলের মানুষদের অত টাকা ভাড়া দেওয়ার ক্ষমতা নেই। এখন হয় গরুর গাড়ি, নয় সাইকেল রিকশাতে আসতে হয়। তবে চড়াইডিহর আগে যে চড়াইটা আছে সেটা সাইকেল রিকশাতে করে ওঠা যায় না তাই চরাইডিহর যাত্রীরা ঐ চড়াই এর শুরু যেখানে সেখানে নেমে গিয়ে হেঁটে আসে আর তপুর মতো কেউ এলে, সঙ্গে মালপত্র থাকাতে, গরুর গাড়িতে। ●



বুক অবধি টানা, হলুদ আর লাল চেক চেক কম্বলটার গায়ে পুবের জানলা দিয়ে রোদ এসে পড়েছে। রোদ পড়েছে আমার পায়ের উপরে। একটা দুর্গা টুনটুনি ডাকছে জবা গাছের ডালে বসে। অন্যদিকের রঙ্গনের ঝোপে দুটি সিপাহী বুলবুল রঙ্গনের ঝোপের গায়ের শিশির ঝরিয়ে লড়াই করছে। ম্যাগনোলিয়া গ্র্যান্ডিফ্লোরা গাছটা শিশিরস্নাত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে জানলার পাশে। সারা রাত শিঁশির পড়েছে।

এই ঘরটা বড়মামির ছেলে রাহুলদার ঘর ছিল। সকালের রোদ শিশিরভেজা গাছপালার পাতার উপরে পড়ায় পুরো এলাকাটাই পি. সি. চন্দ্র জুয়েলার্স-এর বড়বাবু জওহরলাল চন্দ্রর চেম্বার হয়ে গেছে যেন। হাজার হাজার হিরে ঝিকমিক করছে চারধারে।

—শালুকফুল আমার গায়ের পাশের জানলার গরাদের সামনে দাঁড়িয়ে সাদা দু-সারি সুচারু দাঁতে হাসি চমকিয়ে বলল, চা আনব? তপুদাদা?

—শালুকফুলকে দেখতে শালুকফুলেরই মতো। শালুকফুল বড়মামিমার কাছেই থাকে। বয়স হবে উনিশ-কুড়ি। এই আদিবাসী তরুণীর মধ্যে সৌন্দর্য তো আছেই কিন্তু তার চেয়েও বেশি যা আছে তা অপাপবিদ্ধতা-অকলুষতা-অনাঘ্রাতা এক ভাব—যেন সত্যিই শালুকফুলটি। তাছাড়া আছে অনাবিল প্রাণবন্ততা। চলকে চলকে হাঁটে, ছলকে ছলকে কথা বলে। "Sweet seventeen yet unkissed." এরই মতো।

—আমি ওর মুখের দিকে মোহাবিষ্টর মতো কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললাম, আনো।

—বলেই, কম্বল সরিয়ে উঠে ঘরের দরজার খিল খুলে দিলাম। খুলে দিয়ে, আবারও গিয়ে শুয়ে পড়লাম।

গতকাল শালুকফুল বাড়িতে ছিল না। সকালে বা রাতে দেখেনি তাকে। কোথায় গেছিল তা তপু জানে না। সম্ভবত সে সকালেই ফিরেছিল। ফিরেই, বড়মামিমার ঘরে কী কাজে যেন ব্যস্ত ছিল। ভাল করে দেখেনি তপু।

বড়মামির ছোট্ট পুকুরে বড় বড় রাজহাঁস সাঁতার কাটছিল। তারা বড় উচ্চস্বরে ডাকে। তাদের পাহারাদার হিসাবে রেখেছেন বড়মামিমা কিন্তু শেয়ালদের হাত থেকে তাদের বাঁচাবার জন্যে পাহারাও কম দিতে হয় না ঘেটো, হনসো আর শালুকফুলকে। তবে পাহারাদার হিসাবে রাজহাঁসদের জুড়ি নেই। অ্যালসেশিয়ান কুকুরেরাও হার মানে তাদের কাছে। তাদের চোখ এড়িয়ে দুনিয়ার কোনও চোরেরই মনিবের বাড়ির ছায়ার কাছেও আসা সম্ভব নয়।

—আলসেমির চূড়ান্ত করে শুয়ে থাকতে বড় ভাল লাগছিল আমার। ছুটি মানে, পুরোপুরিই ছুটি। দৈনন্দিনতার থেকেই ছুটি। আমি ছুটিতে এইরকম কোনও জায়গাতে এলে খবরের কাগজ পড়ি না। অবশ্য পাইও না। টিভিও দেখি না। যখন খুশি চান করি, যখন খুশি খাই, যখন খুশি ঘুমোই। রোজ দাড়ি কামাই না। শহরের সব বাধ্যতামূলক অভ্যেসকে পুরোপুরি বর্জন করে আমার ছুটির প্রতিটি মুহূর্তকে আমি পুরোপুরি উপভোগ করি তারিয়ে তারিয়ে।

—গত রাতে জোজোমামার হলুদ বাড়ির গেট অবধি গিয়েও আমি ভিতরে ঢুকিনি। আমার সাড়া পেয়ে জোজোমামার বাড়ির অ্যালসেশিয়ান কুকুরটা কয়েকবার ডেকে উঠেছিল কিন্তু যেহেতু আমি খুলিনি তাই থেমেও গিয়েছিল। আমি আবার সেই চাল-ধোওয়া রঙের আলো মাখা সন্ধেতে গাছেদের আর পাতাদের আর ফুলেদের গায়ের গন্ধের মধ্যে ভাসতে ভাসতে ধীর পায়ে বড়মামার বাড়ির দিকে ফিরে গেছিলাম। বড়মামার বাড়ির নাম 'ছুটি'। দারুণ পছন্দ নামটি। 'দ্যা রিট্রিট'-এর মতো ইংরেজি-ঘেঁষা নাম নয় এ।

আমার মাথার মধ্যের রসায়নে কী ঘটে গেছে ও ঠিক বুঝতে পারছে না কিন্তু 'দ্য রিট্রিট'-এর গেট অবধি এসেও ফিরে যাওয়ার কারণ কি শালুকফুলই?

'লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট' কথাটা শুনেছিলাম ছেলেবেলা থেকেই কিন্তু শালুকফুলকে দেখার পর থেকেই আমি বুঝতে পেরেছি যে কথাটা কী সাংঘাতিক সত্যি! অমন বোকা বোকা ব্যাপার এই একবিংশ শতাব্দীতেও ঘটতে যে পারে তা আমার নিজেরই বিশ্বাস হচ্ছিল না। খয়েরি-রঙা একটি কটকি শাড়ি, খয়েরি-রঙা ব্লাউজ পরা, তেল-মাখা চুলে দু-বিনুনি করা উজ্জ্বল দীপশিখার মতো এই শ্যামবর্ণা আদিবাসী মেয়েটিকে দেখা মাত্রা আমি নিজের বুকের মধ্যে ধুকপুকানি বোধ করতে শুরু করেছি। মামিমার সঙ্গে ওর সহজ সরল সপ্রতিভ ব্যবহার এবং মামিমারও ওর প্রতি মমতাময় ব্যবহারে ও যে এই পরিবারেই মেয়ে নয় তা একটুও বুঝতে দেয়নি।

—মামিমা বলেছিলেন, দাদাবাবুর ঘরটা ভাল করে পরিষ্কার করেছিস তো তোষক বালিস সব রোদে দিয়েছিলি? পাশ বালিস? কম্বল?

—হ্যাঁ গো মা। তুমি নিজে একবার চলো না দেখবে। তোমার কলকাতার ভাগ্নের একটুও অযত্ন করব না আমি। তুমি নিশ্চিন্তে থাকো।

বড়মামিমার একটা রঙিন টিভি আছে কিন্তু এখানে কেবল্ চ্যানেল নেই। শুধুই দূরদর্শন পাওয়া যায়। আমি যখন জোজোমামার বাড়িতে যাবে বলে রওয়ানা হয়েছিলাম তখন সাতটার খবর পড়ছিল ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য। হন্সো টিভির সামনে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে খবর দেখছিল ও শুনছিল। বড়মামিমাও এসে বসলেন সোফাতে। বড়মামিমা বিকেলে বলছিলেন, যে শালুকফুলের টিভির পোকা হওয়ার কথা ছিল কিন্তু আমি যখন দেখি তখনই ও দেখে। ওর আসল ভালবাসা বইয়ের প্রতি। তারপর বললেন, টিভির নেশা হনসোর। আমি ঘুমিয়ে পড়লেও সে ভল্যুম কমিয়ে টিভির সামনে বসে থাকবে। সিরিয়াল দেখবে। শালুকফুল রাতে লাইব্রেরি ঘরে অনেকক্ষণ থাকে। দেরি করে শুলেও খুবই ভোরে ওঠে। কাজে কোনও গাফিলতি নেই। এই তো আমার ডান হাত। মেয়েটা খুব ইনটেলিজেন্টও। গত কয়েক বছরের মধ্যে বাংলা ও ইংরেজি পড়তে ও লিখতে শিখে গেছে। এলিমেন্টারি ম্যাথমেটিক্সও। ওই তো এখন আমার অ্যাকাউন্ট্যান্ট। হিসাবপত্র সব ওই-ই রাখে। বাগানের ইজারাদাদেরও ওই সামলায়। তাছাড়া, লেখাপড়াতে জেনুইন ইন্টারেস্ট আছে। তোর বড়মামার লাইব্রেরি ঘরে গিয়ে দেখিস—নতুন বই তো খুব কমই কিনি আমি কিন্তু পুরনো বইগুলোই কী যত্ন করে যে ও রাখে তা বলার নয়, এবং নিয়মিত বিভিন্ন বিষয়ের বই পড়ে।

এখন এমন বই যে আমিও কোনওদিন পড়িনি। তোর বড়মামার তো নানা দিকে ইন্টারেস্ট ছিল! যে, নিজে বই ভাল না বাসে তার পক্ষে অমন করে বইয়ের যত্ন নেওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া, বই-এর ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে সে মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসে বাংলা ইংরেজি সব বই-ই পড়তে শুরু করে দেয়। যেদিন ও লাইব্রেরি ঘরে ঢোকে সেদিন নাওয়া-খাওয়ার সময়ের ঠিক থাকে না ওর।

—তারপর বলেছিলেন, ওকে একটা বাংলা আর একটা ইংরেজি ডিকশনারি কিনে দিয়েছি। কোনও বই পড়তে পড়তে ইংরেজি বা বাংলা যে শব্দের মানে না বোঝে তা একটা কাগজে লিখে রাখে তারপর রাতে সব কাজ শেষ করে সেই সব শব্দের মানেগুলো পাশে পাশে লিখে রাখে। না, এটা ঠিক, ওর শেখার, জানার, খুবই ইচ্ছা আছে। এখনকার কারিকুলাম-এর তো আমি খোঁজ রাখি না তবে মনে হয় ও সহজেই ক্লাস এইট-নাইনে ভর্তি হতে পারে। তবে ফর্মাল এডুকেশনের দরকারই বা কী? আজকাল স্কুল-কলেজে যা অশ্বডিম্ব পড়ানো হয়! প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি স্কুলেরও বিদ্যের বহর দেখে ভিরমি খেতে হয়। শিক্ষকতা এখন আর কোনও ব্রত নয়, একটা পেশামাত্র।

—চা এনেছি।

বলে, ঘরে ঢুকল শালুকফুল। তারপর বিছানার পাশের সাইড টেবল এর উপরে চায়ের ট্রেটা নামিয়ে রাখল। লিকার, দুধ, চিনি আলাদা আলাদা পটে—পেয়ালা-পিরিচ-চামচ—একটি প্লেটে দুটি চকোলেট ক্রিম বিস্কিট এবং দুটি ক্রিম ক্র্যাকার।

—বড়মামা অত্যন্ত সৌখিন মানুষ ছিলেন। ইংলিশ ওয়েজউড-এর ক্রকারি। ক্রকারির দিকে তাকিয়ে ছিলাম। গত রাতের খাওয়ার সময়েও লক্ষ্য করেছিলাম।

—চা বানিয়ে দেব?

—বলল, শালুকফুল।

—না, আমিই বানিয়ে নেব। আমি পাতলা লিকার খাই, কম দুধ এবং এক চামচ চিনি।

—ঠিক আছে। কাল আমি বানিয়ে দেখাব মনোমতো হল কি না!

তারপর একটু চুপ করে থেকে আমার মুখের দিকে চেয়ে বলল আপনার বুঝি কোনও কিছুই মনোমতো না হলে চলে না?

—প্রশ্ন শুনে একটু চমকে উঠলাম আমি। সাধারণত কোনও কাজের মেয়ে এভাবে কথা বলে না। বুঝলাম যে বড়মামিমার এই সংসারে শালুকফুল নেহাতই একজন কাজের মেয়ে নয়, সে এ বাড়িরই একজন এবং সেই অধিকার বড়মামিমা ওকে হয়তো শুধুমাত্র আধখানাই দিয়েছিল, আর বাকি আধখানার অধিকার ও ওর আন্তরিকতাতে ও ভালোবাসাতে এবং সম্ভ্রান্ততাতেও আদায় করে নিয়েছে।

—আমি চায়ের কাপে দুধ ঢালতে ঢালতে চুপ করে রইলাম।

—শালুকফুল বলল, কই তপুদা, আমার কথার জবাব দিলেন না তো।

—আমি বললাম, ঠিকই ধরেছ তুমি। আমার কোনও কিছুই মনোমতো না হলে চলে না।

কোনো কিছুই নয়?

কোনো কিছুই নয়।

—মা জিজ্ঞেস করলেন, ব্রেকফাস্টে আপনি কী খাবেন?

শালুকফুল বলল।

—লক্ষ্য করলাম যে নাস্তা না বলে ও ব্রেকফাস্ট বলল।

—বললাম, যা খাওয়াবে তাই খাব।

—আমি যা খাওয়াব তাই খাবেন?

তাই-ই শব্দটি উচ্চারণ করেই নিজেই এক অনামা ও অকারণ অপরাধবোধে জর্জরিত হয়ে গেলাম। ওকে 'তাই-ই' বলার সময়ে আমার চোখ দুটি ওর সুগঠিত দুটি স্তনের উপরে স্থির ছিল। শুধু কি স্তনই? তার মরালী গ্রীবা, ক্ষীণ কটি, তার গলার শিউলিফুলের মালা, কানের শিউলিফুলের দুল সব মিলিয়ে এই ঘরের মধ্যে এক আশ্চর্য আবহ তৈরি হয়েছিল আর তাকে দীপিত করেছিল শরৎকালের রোদ আর বাগানের পাখিদের ডাক। আমার ঘোর লেগে গেছিল। আমি নষ্ট, ভ্রষ্ট হয়ে গেছিলাম মুহূর্তের জন্যে।

তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী শালুকফুলের চোখ আমার চোখের অসভ্যতা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছিল।

মুখে এক দুর্জ্ঞেয় হাসি ফুটিয়ে সে যেন আমার অসভ্য চাউনিকে দেখেইনি এমন ভাব করে বলল, আপনাকে কিছু খাওয়াতে পারি এমন ভাগ্য কি আমার হবে? ভাগ্যও নেই. সাহসও নেই।

—একটি উনিশ-কুড়ি বছরের আপাত-অশিক্ষিত আদিবাসী মেয়ের মুখে এমন কথা শুনব তা আমি ভাবতেও পারিনি। ওকি শরৎবাবুর বইও পড়েছে নাকি? হয়তো পড়েছে। বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎবাবু, তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, সতীনাথ ভাদুড়ি ইত্যাদিদের সব বই তো ছিলই বড়মামার লাইব্রেরিতে।

—আমি চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে চুপ করে রইলাম।

—ও বলল, আপনি তো চান করার পরই ব্রেকফাস্ট খাবেন? নাকি আগে ব্রেকফাস্ট খেয়ে তারপর চানে যাবেন?

মা জিজ্ঞেস করতে বলেছেন।

—বড়মামিমা কোথায়?

—মা পুজোর ঘরে। বেরোতে বেরোতে সাড়ে আটটা।

—বড়মামি বেরোন পুজো সেরে। ততক্ষণ আমি একটু আয়েশ করে শুয়ে থাকি। তোমাদের এই চড়াইডিহ জায়গাটি আমার ভারি পছন্দের।

—আর জায়গাটার মানুষগুলোকে?

—আমি উত্তর দিলাম না সে প্রশ্নের।

—শালুকফুল বলল, জায়গাটার আর কতটুকু দেখেছেন। বিছানাতেই যদি শুয়ে থাকবেন তবে দেখবেনই বা কী করে।

দেখবখন। অঢেল সময় আছে। তাছাড়া, একটু দেখেই পুরোর আন্দাজ করা যায়। সবাই পারে না, আমি পারি।

—আপনি কি আলসেমি করতে খুব ভালবাসেন?

—কখনও কখনও।

—ভাবলাম, ওকে যদি বলতে যাই বার্ট্রান্ড রাসেল-এর 'ইনপ্রেইজ অফ আইড্লেনেস'-এর কথা, তাহলে তা তো ও বুঝবে না। মাথার উপর দিয়ে চলে যাবে। তাই চুপ করেই রইলাম।

—যা ভাল বুঝবেন আপনি। শালুকফুল বলল, হাসি মুখে। ওর মুখে সবসময়ই একটি স্মিত হাসি ফুটে থাকে জলের মধ্যে ফুটে থাকা শালুকফুলের মুখের হাসিরই মতো।

—এ জায়গা কি তুমি আমাকে ঘুরিয়ে দেখাবে?

—দেখাতে পারি। যদি মা দেখাতে বলেন আর আপনি দেখতে চান। জোজোবাবুর বাড়িতে তো পুপু দিদি এসেছেন। আমারই মতো বয়স। তবে

ফটফট করে বড় বেশি ইংরেজি বলেন আর খুবই সুন্দরী। তাঁর সঙ্গেই কি যাবেন?

—তাঁরা তো মোটে এলেনই দুদিন হল। তুমি তাকে দেখলে কী করে!

—বাবাঃ মোটরে করে এসেছেন যে কলকাতা থেকে। যে কদিন থাকবেন মোটরটিও থাকবে এখানে। সঙ্গে ড্রাইভারও এসেছে এবং একজন বেয়ারা। ওদের বাড়িতেই তো গেছিলাম কাল সন্ধেবেলা। মাকে না বলেই। ফিরে এসে খুব বকুনি খেয়েছি। জোজোমামা না খাইয়ে ছাড়লেন না তবে পুপুদিদির খুব দেমাক। ভাল করে কথাই বলল না আমার সঙ্গে। তাছাড়া ইংরেজি ছাড়া কথা প্রায় বলেই না। সঙ্গে বন্ধুও এসেছে একজন।

তারপর বলল, আচ্ছা বাঙালিরা বাড়িতে ইংরেজি কেন বলে বলুন তো? আমি তো ভেবেই পাই না।

কী করে বলব বল। ভিন্ন রুচিহিঃ লোকাঃ।

—মানে?

কথাটা সংস্কৃত। মানে বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন রুচি।

—ও।

কী দেখে এলে?

শালুকফুল বলল, পুপুদিদি অদ্ভুত পোশাকে ছিল।

কেন এ কথা বলছ?

অত ছোট প্যান্ট পরা অত বড় মেয়ে আমি কখনও দেখিনি। কী সুন্দর ফর্সা পা দুখানি। আর তেমনই সুন্দর মুখ। তবে আমার সঙ্গে ভাল করে কথাই বললেন না—এমন একটা ভাব করলেন যেন আমি মানুষই নই। তবে জোজোমামা মানুষ খুব ভাল। ওঁকে তো চিনিই। পুপু দিদিকে চিনতাম না বলেই আলাপ করার আগ্রহ ছিল।

আমার মনে হল, জোজোমামার মেয়ে পুপু বারমুডাজ পরেছিল। শালুকফুল তো কখনও বারমুডাজ দেখেনি। তাই ছোট প্যান্ট-এর কথা বলছিল।

বললাম, সুন্দর পা আর সুন্দর মুখ দিয়ে আমি কী করব। আমি তো তাকে চুমু খেতে যাচ্ছি না আর তার লাথি খেতেও যাচ্ছি না।

শালুকফুল আমার কথা শুনে হেসে উঠল।

বলল, ভারি মজা করে কথা বলেন তো আপনি।

আমি বললাম, যে এখানের সব কিছু চেনে, গেলে তার সঙ্গেই যাব।

বসন্ত দাদা, ঘেটো দাদা অথবা তুমি যে কেউ হলেই আমার কাজ চলে যাবে। তবে চান করে উঠে ব্রেকফাস্ট করে জোজোমামার বাড়ি যাব আগে। জোজোমামা আমাকে খুবই স্নেহ করেন। তবে কলকাতায় তো যোগাযোগ থাকে না। ওঁর স্ত্রী যে মারা গেছেন তাও তো জানা ছিল না আমার। তখন তো আমি বম্বেতে ছিলাম। এখনও বম্বেতেই আছি।

—তাই? বলিউডে গেছিলেন?

বিরক্ত স্বরে আমি বললাম, না। বলিউড হলিউড নিয়ে নাচানাচি করি না আমি।

আমি তো কলেজের ছাত্র নই যে হিরো-হিরোইনদের খবর রাখব?

তুমি কী করো তপুদাদা?

বুঝলাম যে ওর স্বাভাবিকতায় আমাকে আপনি থেকে অনবধানে তুমিতে নামিয়ে এনে ও নিজেকে আমার কাছের মানুষ করে তুলল। নিজের এই অধঃপতন খুব ভাল লাগল আমার।

সমুদ্রের তলায় যে তেল থাকে, গ্যাস থাকে, সেই সব খুঁড়ে বের করি। পার থেকে অনেক দূরে সমুদ্রের মধ্যে থাকি আমরা। অনেক সময়ে মাসের পর মাস থাকি—অন্যসময়ে অল্পদিন।

আমি বললাম।

—কী করে যান সেখানে?

—ছোট ছোট জাহাজ আছে। তাড়া থাকলে হেলিকপ্টারেও যাতায়াত করি।

—এখানে তো কখনও আসেনি হেলিকপ্টার। তবে ছবি দেখেছি আর টিভিতে দেখেছি। নেতারা ধবধবে পোশাক পরে বন্যার সময়ে, খরার সময়ে, ভূমিকম্পের সময়ে তা থেকে নেমে বলেন, 'ভাইও ঔর ব্যহনো'। আরও নানা ভাল ভাল কথা বলেন।

তারপরই বলল, জানো, আমাদের চড়াইডিহর উপর দিয়ে রোজই সকাল দশটা পঁয়ত্রিশে আর বিকেল পাঁচটা দশ-এ প্লেন উড়ে যায়।

—কোথায় যায়?

—তা কী করে বলব। একটা যায় সকালে পুব থেকে পশ্চিমে আর বিকেলেরটা যায় পশ্চিম থেকে পুবে। বম্বে তো পশ্চিমে, না?

তারপরে একটু চুপ করে থেকে বলল, তোমার মালিক কে? আমার মালিক যেমন মা। তোমার কোম্পানির নামটাই বা কী?

—আমার কোম্পানি কোনও বিদেশি ব্যবসাদার নয়। দেশের কোম্পানি। নাম, ও.এন.জি.সি। আর সে কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর হচ্ছেন সুবীর রাহা। একজন বাঙালি। দেখতেও বাঘের মতো, কাজেও বাঘের মতো। খুব সৎ অফিসার। আমাদের এই চোরেদের দেশে এমন অফিসার বেশি নেই। ভগবানের ভয়ে যদি কর্মচারীরা সৎ না হয় তবে রাহা সাহেবের নামে সৎ হতেই হয়।

—তাই? তা তোমার মালিক কোথায় থাকেন? তিনিও কি সমুদ্রের মধ্যে থাকেন?

না। তিনি দিল্লিতে থাকেন, দেরাদুনেও যান। প্রয়োজনে সমুদ্রের বুকেও আসেন।

অয়েল-রিগ বলে তোমাদের কাজের জায়গাকে, তাই না? কিছুদিন আগে একটা জাহাজ ঢেউয়ের দোলা সামলাতে না পেরে কোনও অয়েল-রিগ-এ ধাক্কা মারাতে আগুন লেগে গিয়ে অনেক লোক মারা গেছিল না?

—আমি অবাক হয়ে বললাম, তুমি জানলে কী করে?

—টিভি দেখে। আবার কী করে।

—তারপর বলল, মা টিভি দেখার জন্যে কেবলই বকে কিন্তু টিভি দেখে কত কী জানা যায়, তাই না? আমি কি শুধু সিনেমাই দেখি? আসল তো হল খবর। মা তো বলে আমি নাকি হচ্ছি খবরের কাগজ। সব খবর নাকি আমার কাছেই থাকে। মা খবর-টবর বেশি দেখে না। দেখে মোটামুটি আমিই মাকে বলে দিই। তবে সিনেমার পোকা হনসো দিদি। আমি ক্বচিৎ-কদাচিৎ দেখি। বই পড়তেই আমি বেশি ভালবাসি।

বাঃ তুমি তো দেখছি খুবই বুদ্ধিমতী মেয়ে শালুকফুল?

—বুদ্ধি দিয়ে কী লাভ হল? এ জন্মে তো আর বিএ এমএ পাসও করতে পারব না আর তোমার মতো চাকরিও করতে পারব না। মা, হনসোদিদি আর ঘেটোদাদার সঙ্গে এই চড়াইডিহির 'ছুটি'তেই সারাটা জীবন পড়ে থেকে ছুটি হয়ে যাবে শেষে। লেখা-পড়া শেখা হল না বলে পুপুদিদির মতো ছোট প্যান্টও পরা হবে না। লেখাপড়া শেখাটা খুব দরকার। লেখাপড়া না জানলে, অন্য মানুষে মানুষ বলেই গণ্য করে না।

—তোমার সারাটা জীবন কতখানি লম্বা?

তা কী করে বলব। শেষের কথা শেষই জানে।

—লেখাপড়া তো তুমি নিজের চেষ্টাতেই শিখেছ। স্কুল-কলেজে না গিয়েও মানুষ খুব বড় মানুষ হতে পারেন। রবীন্দ্রনাথ তো স্কুল-কলেজে

যাননি। তাঁর মতো শিক্ষিত মানুষ কজন জন্মেছেন এই দেশে? আমি কলকাতা ফিরে তোমার জন্যে অনেক বই পাঠিয়ে দেব। যার শেখার এত আগ্রহ সে ঠিকই শিখবে। তুমিও বড় হবে, দেখো। বেশি পড়লেই হয় না, যেটুকু পড়েছ সেটুকুকে হজম করতে হবে। পড়ে বদহজম হলে, সে পড়া কোনও কাজে লাগে না। তেমন পড়ুয়ারা পণ্ডিত নয়।

—তবে পণ্ডিত কারা?

আমি হেসে বললাম, রবীন্দ্রনাথ বলতেন, 'যাঁহারা সমস্তই পণ্ড করেন তাঁহারাই পণ্ডিত'।

—শালুকফুল হেসে উঠল এ কথা শুনে শিশুর মতো সারল্যে। বলল, তাই বলতেন বুঝি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

—তারপরই বলল, আমি 'শেষের কবিতা' পড়েছি, 'গোরা' পড়েছি, 'নৌকাডুবি' পড়েছি।

পড়েছ তো। কী বুঝেছ?

—আমি আমার মতো করে বুঝেছি। আমার বুদ্ধি তো বেশি নয়। তোমার মতো বুদ্ধি থাকলে আরও অনেক ভাল করে বুঝতে পারতাম।

একদিন তোমার, আমার চেয়েও বেশি বুদ্ধি হবে।

শালুকফুলের দুটি চোখে হঠাৎ জল এল। মুখ নামিয়ে বলল, তুমি আমার সঙ্গে ঠাট্টা কোরো না তপুদাদা। কত কষ্ট করে ঝি-গিরি করতে করতে যেটুকু শেখার শিখেছি—মায়েরই দয়াতে-মা-ই হাতে ধরে লিখতে-পড়তে শিখিয়েছেন। এগারো বছরে বর্ণপরিচয় দিয়ে শুরু করলে আর কতদূর এগোনো যায়, বলো?

—তুমি কখন আরম্ভ করছ সেটা বড় কথা নয়।

তারপর বললাম, উইনস্টন চার্চিলের নাম শুনেছ?

—না তো।

উনি ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। জার্মানির হিটলার যখন সারা পৃথিবীতে আতঙ্কের সৃষ্টি করেন...

বলেই থেমে গিয়ে বললাম, জার্মানি ও ইংল্যান্ড এই সব দেশের নাম জানো? কোথায় এসব দেশ?

বাঃ। ইংল্যান্ড তো ইংরেজদের দেশ। যারা আমাদের এত বছর পরাধীন করে রাখল তাদের নাম জানব না? আর জার্মানির নামও জানি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তো জার্মানির সঙ্গেই হয়েছিল। তারপর জাপানের সঙ্গে। পার্ল

হারবারে জাপানিরা বোমা ফেলার পর আমেরিকাও সেই যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল।

বাঃ বাঃ। তুমি তাও জানো?

খুবই অবাক হয়ে বললাম আমি।

তারপর বললাম, এত সব কোথা থেকে জানলে? কোন বই পড়ে?

এ সব বই পড়ে জানিনি। মা রোজ আমাকে গল্প বলেন। নানা বিষয়ের গল্প। মায়ের মুখেই শুনেছি এসব।

বড়মামিমার উচিত বাড়িতে একটা স্কুল খোলা।

স্কুল না খুললেও তোমার বড়মামার নামে চড়াইডিহতে প্রাইমারি স্কুল আছে। সেখানে তো প্রতি সপ্তাহে একটি দু-ঘণ্টার ক্লাস নেন মা। সেই ক্লাসে স্কুলের ছাত্রছাত্রীর মা-বাবারাও এসে হাজির হন। মা যেটা করেন সেটা মস্ত কাজ। মা সকলের মধ্যে জানার ইচ্ছাটা জাগিয়ে দেন—ছোট-বড় সকলের মধ্যেই। নানা গল্প বলেন ক্লাসে। মা আমাকে বলেন, আর ক-বছর পরে তোকে ওই স্কুলের দিদিমণি করে দেব। আমি বলি, আমি নিজেই কোনওদিন স্কুলে গেলাম না আমি দিদিমণি হলে পড়ুয়ারা মানবে কেন আমাকে?

মামিমা কী বলেন?

মামিমা বলেন, মানবে রে ঠিকই মানবে। আমার বিচারে ভুল হবে না। সারাজীবন যে অনেকই দেখলাম।

তারপর বলল, জানি না, সত্যিই মানবে কি না!

চা খাওয়া শেষ করে আমি বিছানাতে উঠে বসলাম। পায়ের উপরে কম্বলটা মেলে দিয়ে রোদটা তখন ঘরের আধখানাতে ছড়িয়ে গেছে। শালুকফুল দরজার একটা পাল্লাতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েই ছিল একটু বেঁকে। আমি বললাম, দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন? বোসো না। এতক্ষণ ওর কথা শুনে এবং ওর সঙ্গে কথা বলে বেশ বুঝতে পারছি যে শালুকফুল এ বাড়ির দাসী নয়, মেয়ে। বড়মামিমা তাকে নিজের মেয়ের মতোই যত্নে ও ভালবাসায় নিজে হাতে গড়ে তুলেছেন। ওর জীবনের প্রথম দিকের কটা বছর নষ্ট হয়েছে হয়তো কিন্তু পরের কটি বছর পুষিয়ে দিয়েছেন বড়মামিমা। শালুকফুলের কথা তো বড়মামিমা আমাকে কিছু জানাননি, জানালে এই ফুলটিকে দেখতেই আমি চলে আসতাম চড়াইডিহতে। এই পাহাড়ি জায়গার বনজঙ্গলের মধ্যে অযত্ন-বর্ধিত এই অভাবনীয় গৃহপালিত জীবটি বড়মামিমার যাদু-স্পর্শে একটি ম্যাগনোলিয়া গ্র্যান্ডিফ্লোরার মতো ফুটে আছে তার পরিবেশে আলো করে।

তাকে বসতে বলাতে শালুকফুল হেসে বলল, ঠিক আছি। তোমার সামনে বসার যোগ্যতা আমি এখনও অর্জন করিনি। যেদিন করব, সেদিনই বসব।

তারপরই বলল, আপনি উইনস্টন চার্চিলের কথা বলছিলেন, কই? আর কিছু বললেন না তো।

বললাম, উইনস্টন চার্চিলের 'ওয়ার মেমোয়ার্স' তোমাকে দেব আমি। তিন খণ্ড। ওরকম ইংরেজি খুব কম মানুষই লিখেছেন আজ অবধি। যদিও উনি সাহিত্যিক ছিলেন না।

ওয়ার মেমোয়ার্স লাইব্রেরিতে আছে। নেড়েচেড়ে দেখেওছি। কিন্তু ওই বই পড়ার মতো ইংরেজি জ্ঞান হতে এখনও অনেক সময় লাগবে, কোনওদিনও হবে কি না জানি না। আসলে, আপনার মতো মানুষ তো কাছে পাই না! পড়ে আর কতটুকু শেখা যায়? মা বলেন, জীবন থেকে শিখবি, মানুষের সঙ্গে মিশে শিখবি, চিতায় ওঠার আগের মুহূর্ত অবধি শিখবি। শেখার ইচ্ছাটা যেন কখনও মরে না যায়।

শালুকফুল বলল, তপুদাদা, আপনি বলছিলেন, চার্চিলের কথা, উইনস্টন চার্চিলের কথা...

—ও হ্যাঁ। তোমার এই পরিচয়টা তো আমার অজানা ছিল। এই ব্যাপারটার অভিঘাত এখনও কাটিয়ে উঠতে পারোনি?

—অভিঘাত মানে কী? আর কীসের পরিচয়?

—এই রে। বিপদে ফেললে তো। অভিঘাত মানে, সম্ভবত Impact।

—বাংলা প্রতিশব্দ নেই?

—নিশ্চয়ই থাকবে। তোমার অভিধানে যদি না পাও তাহলে কলকাতা ফিরে আমি লিখে জানাব।

আর 'পরিচয়টা ' মানে?

মানে তুমি যে এমন শিক্ষিত, তোমার যে এত বিষয়ে জ্ঞান আছে, তার চেয়েও বড় তোমার যে এতখানি জানার ইচ্ছা আছে তা তো আমি জানতাম না।

তা অবশ্য ঠিক।

এবার চার্চিলে ফিরুন। মায়ের পুজো শেষ হয়ে এসেছে। ব্রেকফাস্টের বন্দোবস্ত না করে আমি এখনও আপনার সঙ্গে গল্প করছি জানলে আমার কপালে দুঃখ আছে।

হ্যাঁ। উইনস্টনের পড়াশোনা বিশেষ হল না যখন, তখন অতি অল্প বয়সে উনি ক্যাভালরি রেজিমেন্টে, মানে ঘোড়সওয়ার হয়ে আর্মিতে যোগ দিলেন। তাঁকে ভারতে পাঠানো হল। ব্যাঙ্গালোরে পোস্টেড ছিলেন তখন। পোলো খেলেন আর জুয়া খেলেন রাতে। বয়স সতেরো হবে। উইনস্টনের চেহারা তুমি তখন যদি দেখতে। সরু কোমর, চওড়া বুক, রাজপুত্রই যেন। আমরা তো মোটাসোটা ডাবল-চিনের চার্চিলকেই জানি। পাহাড়ের মতো বপু।

ওঁর মা কিন্তু ছেলের উপরে আশা ছাড়েননি। তিনি ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য, দর্শন নানা বিষয়ের বই পাঠাতেন গাদা গাদা, উইনস্টনকে। মায়ের পাঠানো বইগুলি পড়তেনও উইনস্টন। এমনইভাবে আমাদের শালুকফুলেরই মতো, এমনকি রবীন্দ্রনাথেরও মতো, স্কুলে বা কলেজে না গিয়েই বাড়িতে পড়াশোনা করতে করতেই হঠাৎ একদিন ওঁর মনে হল যে, জীবনের এতগুলো বছর উনি নষ্ট করেছেন। যা নষ্ট করেছেন তা তো করেছেনই! এবারে গড়ে তোলার শুরু করতে হবে, জীবনে একজন মানুষের মতো মানুষ হতে হবে। এমনই ঠিক করলেন উইনস্টন।

তখন সম্ভবত ওঁর বয়স তেইশ-টেইশ হবে। ওঁর আত্মজীবনী 'মাই আর্লি লাইফ'-এ পরে উনি লিখেছিলেন 'দিস মাই অ্যাডভাইস টু ওল দি ইয়াং মেন অ্যান্ড উইমেন বিটউইন দি এজেস অফ সেভেনটিন টু টুয়েন্টি থ্রি : রোল আপ ইওর স্লিভস এবং মেক ইওর ডেস্টিনি।'

তারপর একটু চুপ করে থেকে শালুকফুলকে বললাম যে, তাই তোমাকেও আমি বলছি যে, দেরি কিছুই হয়নি। যদি তেইশ বছরে শুরু করে কেউ উইনস্টন চার্চিল হতে পারেন তবে তুমিও একজন কেউ-কেটা হতে পারবে শালুকফুল। এই জীবনেই। এক জীবনেই।

তারপর বললাম, হিটলার যখন ব্রিটিশ এয়ারফোর্সকে মুছে ফেলার জন্যে ঝাঁক ঝাঁক প্লেন পাঠালেন এবং রয়াল এয়ার ফোর্স-এর সামান্য সংখ্যক প্লেন এবং মুষ্টিমেয় পাইলটেরা দেশকে বাঁচাবার জন্যে প্রাণপণে লড়ে এবং বীরের মতো মরে তাদের প্রতিহত করল তারপর দিন ব্রিটিশ পার্লামেন্ট উইনস্টন চার্চিল শোকস্তব্ধ এম.পি.-দের বললেন, 'নেভার ইন দ্য হিস্ট্রি অফ ম্যানকাইন্ড সো মেনি, হ্যাড ওওড সো মাচ, টু সো ফিউ।' মুষ্টিমেয় ব্রিটিশ পাইলটদের 'ব্যাটল অফ ব্রিটেইন'-এ জার্মান বিমান-বাহিনীকে দুঃসাহসিক লড়াই লড়ে হারিয়ে দেওয়ার জন্যেই উনি এই কথাগুলি বলেছিলেন। কী সোজা ইংরেজিতে কী অসাধারণ বাক্যবন্ধ। ভাষার জোর একেই বলে।

শালুকফুল বড় বড় চোখ করে চুপ করে রইল।

তারপর বলল, আপনি কত্ত জানেন। আপনি এখানেই থেকে যান না তপুদাদা। মায়ের এতবড় বাড়ি এত জমিজমা, মায়ের এই স্কুল এসবের দেখাশোনা করার তো কেউই নেই। সমুদ্রের মধ্যের আস্তানাতে বাস করে তেল আর গ্যাস তোলবার কী দরকার? মাটিতে থাকুন—ছয় ঋতুর সৌন্দর্য উপভোগ করুন—এখানের হতভাগা মানুষদের পাশে থাকুন—আর আমরা তো আছিই আপনার সেবা করবার জন্য। দিনই না আমাদের একটু সুযোগ। মা তাহলে কত যে খুশি হবেন।

—জানি তা।

বললাম, আমি।

তারপর বললাম, অন্যকে সুখী করতে কার না ভাল লাগে বলো? তবে কলকাতাতে যে আমারও মা আর বাবা থাকেন। তাঁদেরও যে আমিই একমাত্র সন্তান। তাছাড়া, কলকাতা শহরটা একটা অজগর সাপের মতো। তাতে একবার ঢুকে গেলে যতক্ষণ না সে নিজে তোমাকে উগরে দিচ্ছে ততক্ষণ তোমার বেরিয়ে আসার কোনও উপায়ই নেই।

আমার সমস্যার সহজ সমাধান করে দিয়ে শালুকফুল বলল, তাঁদেরও নিয়ে আসুন। সকলে মিলে সহজেই থাকা যাবে। এ বাড়িতে সাতটা শোবার ঘর উপর-নীচ মিলিয়ে। জায়গারও তো অভাব নেই। কোনও কিছুরই অভাব নেই। আপনার মাকে এবং বাবাকে বুঝিয়ে বলুনই না। বাবা তো রিটায়ার করেছেন?

না। সেটাও একটা অসুবিধে। এখনও সাত-আট বছর বাকি।

তারপরে আমি শালুকফুলের উড়ন্ত উৎসাহের ডানা ছেঁটে দিয়ে বললাম, হবে, হবে। সব সমস্যার সমাধান একই সঙ্গে করতে যাওয়াটা মূর্খামি। বুঝেছ শালুকফুল।

শালুকফুল তবুও বলল, ভি আর এস নিতে বলুন না তপুদাদা।

বাবাঃ তুমি VRS-ও জানো?

টিভি দেখলে সব জানা যায়।



ঝলমলে শারদ সকালে ওই বনময় পরিবেশের মধ্যে 'দ্য রিট্রিট'-এর দিকে হেঁটে যাচ্ছিলাম। পথের দুপাশের ঝোপে-ঝাড়ে ফুড়ুৎ করে নানা ছোট ছোট পাখি ওড়াউড়ি করছিল। পাখিদের নাম জানি না। জানলে, ভাল হত। অধিকাংশ বাঙালি লেখকেরাই চিরদিন লিখে এসেছেন 'কী এক নাম না জানা পাখি ডাকিতে ডাকিতে উড়িয়া গেল'। দু-একজন লেখক ছাড়া গাছ বা পাখির নাম কেউই জানেন না। ভাবছিলাম, লেখকেরাই যদি না জানেন তবে আমার মতো সাধারণ মানুষেরা জানবে কী করে! অধিকাংশ বাঙালি লেখকেরই সাধারণ জ্ঞানের মানটা বিশেষ উঁচু নয় তবে নতুন প্রজন্মের অল্পবয়সী লেখকেরা অন্যরকম।

যখন 'দ্যা রিট্রিট'-এ বা 'হলুদ বাড়ি'তে গিয়ে পৌঁছলাম তখন দেখলাম জোজোমামা বাগানে গাছগাছালির পরিচর্যা করছেন এবং বারান্দাতে ফেডেড জিনস আর বাসন্তি রঙা টপ পরে বেতের চেয়ারে বসে একটি ইংরেজি বই পড়ছে একটি সুন্দরী মেয়ে। তাকে দেখতেও বিদেশিনীরই মতো। মামিমা, মানে, জোজোমামার স্ত্রী তো ইংরেজই ছিলেন। অপরূপ সুন্দরী। কিন্তু শাড়ি পরতেন। পরিষ্কার বাংলা বলতে পারতেন এবং বাংলা বইও পড়তেন। রবীন্দ্রনাথের অন্ধ ভক্ত ছিলেন। জোজোমামার শান্তিনিকেতনের রতনপল্লীতেও একটি বাড়ি আছে। তবে আজকাল কম যান, বড়মামির কাছে শুনেছি। উনি নাকি বলেন, শান্তিনিকেতন আর সেই শান্তিনিকেতন নেই,

কলকাতা বড় বেশি প্রভাব ফেলেছে তার উপরে। কলকাতার সব বড়লোক পেশাদার ও ব্যবসাদার গিয়ে ঘাঁটি গেড়েছেন সেখানে। নির্জনতা নেই। ভাববার, লেখবার, ছবি আঁকার জায়গা নেই আর শান্তিনিকেতন।

মেয়েটির বয়স হবে শালুকফুলেরই মতো। তার পাশের চেয়ারই একটি ওই বয়সী ছেলে একটি ময়ূরকণ্ঠী রঙা বারমুডাজ পরে হাতে একটি ইংরেজি বই নিয়ে বসে আছে। কিন্তু পড়ছে না। সম্ভবত এই শরৎকালের প্রকৃতি তার উপরে অমোঘ প্রভাব ফেলেছে। বই হাতে করেও সে পড়তে ভুলে গেছে।

জোজোমামা আমাকে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, আরে! তপু যে। কবে এলে?

গতকাল সকালে।

ট্রেনে এলে?

হ্যাঁ।

তারপর স্টেশন থেকে কিসে এলে?

গরুর গাড়িতে।

বাঃ।

তারপর জোজোমামা বললেন, আমাদের স্টেশনটির নামটি ভারি ভাল। তাই না?

ভালই তো। ফুলকুঁড়ি যে, কোনও রেলস্টেশনের নাম হতে পারে, তা ভাবাই যায় না।

সত্যিই তাই।

তুমি কি প্রতি বছরই আসো?

ইচ্ছে তো করে। কিন্তু প্রতি বছর আসা হয় কোথায়?

—মা-বাবার কী খবর? এখানে আসার আগে ফোন করেছিলাম। তোমাদের কাজের লোকটি বলল, ওঁরা দেশের বাইরে গেছেন।

—হ্যাঁ। কুয়ালালামপুর গেছেন। মালয়েশিয়ান এয়ারওয়েজ দারুণ প্যাকেজ দিচ্ছে। মালয়েশিয়া দেখা ছিল না, তাই দেখতে গেছেন।

—ভালই তো। ট্রাভেলিং ইজ এডুকেশন। তা, তুমি গেলে না কেন?

—আমি বম্বে থেকে পরে এসেছি। তাছাড়া পাঁচ বছর পরে এখানে এলাম। বড়মামি একলা থাকেন। বড়মামা আমাকে খুবই স্নেহ করতেন। শেষবার এসেছিলাম তো পাঁচ বছর আগে। আমি এখানে এলে মাও খুব সুখী হন। মামাবাড়ির সঙ্গে যোগসূত্র বলতে তো এখন একমাত্র বড়মামিমাই।

জোজোমামা বললেন আমার মনে আছে। সেবারেই তো তোমার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল আমার প্রথম আলাপ নয়, বলব বন্ধুত্ব। আলাপ তো ছিল তুমি যখন স্কুলে পড়তে তখন থেকেই। তুমি তো সেইন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে পড়তে, তাই না? আমার ভাগ্নে তিতাসের সঙ্গে আর সত্যি কথা বলতে কি প্রথম দর্শনেই, আই ডেভালাপড আ লাইকিং ফর ইউ।

থ্যাঙ্ক ইউ।

আমি বললাম।

তারপর বললাম, হ্যাঁ। আমি আর তিতাস। সেইন্ট জেভিয়ার্স কলেজেও পড়তাম একই সঙ্গে। খুব ভাল ক্রিকেট খেলত ও। কলেজ টিমের ক্রিকেট ক্যাপ্টেন ছিল। তারপর ও তো আর্মিতে চলে গেল। আর কোনও যোগাযোগ নেই।

আমার সঙ্গে আছে। এখন পুণেতে আছে। একটি মারাঠি মেয়েকে বিয়ে করেছে।

তারপরে জোজোমামা বললেন, এবারে আমাদের সঙ্গে আমার ছোট মেয়ে পুপু এসেছে। আর সঙ্গে তার বয়ফ্রেন্ড আকাশ। চলো, আলাপ করিয়ে দি। ওরাও 'মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে করে গমন সেই পথ সদা বরণীয়, জ্ঞানে স্টেটস-এ চলে যাচ্ছে।

বলেই বললেন, কবিতাটি কি ভুল বললাম? কথাটা কি গমনীয় সেই ছেলেবেলাতে পড়া।'

—আমি তো জানিই না।

নির্লজ্জর মতো বললাম আমি।

—সত্যি! তোমরা দিশি কিছুরই খোঁজ রাখো না। গ্লোবাইলাইজেশন একেবারে তোমাদের অন্দরমহলে ঢুকে পড়েছে। সচ্ছল বাঙালিরা আর বাঙালি নেই। সব সাহেব হয়ে গেল। চোখের সামনে দেশটা কেমন বদলে গেল। মাঝে মাঝে মনে হয়, আমরা, মানে, আমাদের জেনারেশনের মানুষেরা এবারে চলে গেলেই ভাল। তোমার মামিমার তো ছুটি হয়ে গেছে। ছেলে ও মেয়ে কেউই মায়ের শ্রাদ্ধের সময়ে আসতেই পারল না। তিতাস কিন্তু এসেছিল পুণে থেকে।

খবর পেলে আমিও আসতাম জোজোমামা বম্বে থেকে। তবে আমি তো মাঝসমুদ্রে থাকি। খবরটা পেয়েছিলাম শ্রাদ্ধ হয়ে যাওয়ার পরে।

তুমি তো ও.এন.জি.সি.-তে আছো, তাই না? সুবীর রাহা আমার ক্লাস ফ্রেন্ড ছিল স্কুলে। ও তো এখন আমাদের গর্ব।

তারপর বললেন, আমার বড় মেয়ে 'আর ছেলে দেশেই আর ফিরবে বলে মনে হয় না। পুপুও তো চলে যাচ্ছে। এদের সকলেরই এমন একটা অ্যাটিচিউড যে বিদেশে না গেলে জীবনটাই যেন বৃথা হল। অথচ আমাদের দেশটা কী সুন্দর!

তারপর বাগান থেকে পাথওয়েতে উঠে বললেন, চলো, তোমার সঙ্গে ওদের আলাপ করিয়ে দিই।

—পুপু, জোজোমামার ছোট মেয়ে, চেয়ার ছেড়ে উঠে দেখন-হাসি হেসে, আমাকে বলল, হাই।

তারপর বয়ফ্রেন্ড আকাশ চোপড়াও বলল, হাই। নাইস মিটিং উ।

জোজোমামা পুপুকে বললেন, তোরা বসে বসে বই না পড়ে তপুর সঙ্গে যা না, চিরাইডোংরিতে ঘুরে আয়, ভাল লাগবে। আজ তো পঞ্চমী। আজই তো চড়াইডিহর পুজোর বোধন হবে। কাল থেকে ঢাকের শব্দ শোনা যাবে। কলকাতাতে তো আর ঢাকের বাদ্যি শোনাই যায় না—। এখানে একচালার প্রতিমা। হেহেপুরার বড় কুমোর তিনমাস ধরে ভক্তিভরে মূর্তি গড়ে। এখানে এলে মনে হয়, সময় এখনও থেমে আছে। সময় দৌড়চ্ছে না। চারদিকের এই দৌড়াদৌড়ির মধ্যে আমার এখানে এলে ভারি ভাল লাগে। একটা আনওয়াইন্ডিং এফেক্ট হয়। পাখির ডাক আর বনের গন্ধে নার্ভগুলো সব সুথড হয়ে যায়। আমি এখানে বসে ওয়াল্ট হুইটম্যানের 'লিভস অফ গ্রাস' পড়ি, হেনরি ডেভিড থোরোর 'ওয়ালডেন' বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক', রবার্ট ফ্রস্ট-এর কবিতা। আর রবীন্দ্রনাথ তো পড়িই। রবীন্দ্রনাথ আর অতুলপ্রসাদের গান শুনি। আমার পুনর্জন্ম হয়। নিজেকে 'নবীকৃত' না কী বলে আধুনিক বাংলা ভাষাতে, তাই করি। আসলে, বুঝলে তপু, মাটির কাছাকাছি না থাকলে, মানুষ বোধহয় অমানুষ হয়ে যায়। আমার স্ত্রী কেটি এ কথা' বার বার বলত।

মামিমার নাম কেতকী ছিল না?

সে নামতো আমি দিয়েছিলাম। বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনেরা কেতকী বলেই ডাকত, শুধু আমিই ডাকতাম কেটি বলে।

আমি চুপ করে রইলাম।

পুপু বলল, বাবা তুমি এখনও প্রি-হিস্টরিকই রয়ে গেলে। তোমার মেন্টাল ফ্রেম-এ ডাইনোসোরের গায়ের গন্ধ আছে। মানুষ যখন চাঁদে যাচ্ছে, মঙ্গল গ্রহে যাচ্ছে তুমি তখনও তোমার টিকলিগড়, আর চড়াইডিহর

চিরাইডোংরির দুর্গাপুজো নিয়েই পড়ে আছ। তবে উ হ্যাভ এভরি রাইট টু পারস্যু ইওর ওওন আইডিয়াজ, ইওর ওওন ওয়ে অফ লাইফ কিন্তু তা বলে আমাদের উপরে তোমার মতামত তুমি জোর করে চাপিয়ে দিতে পারো না। লিভ অ্যান্ড লেট লিভ।

আকাশ, বাংলা বোঝে না কিন্তু এটুকু বোধহয় বুঝল যে মেয়ের সঙ্গে বাবার কোনও বিষয়ে মতানৈক্য ঘটেছে। সে চুপ করে পুপুর মুখে চেয়ে রইল।

জোজোমামা আমার সামনেই যে পুপু তাঁকে নস্যাৎ করল তা দেখে একটু অপ্রতিভ হলেন।

বললেন, আমি তো তোদের যেতে বাধ্য করছি না। সাজেস্টই করেছিলাম মাত্র।

আমার মনে হল পুপু আর তার বন্ধু আকাশ আমার এই না বলে-কয়ে হুট করে আসাটা বিশেষ পছন্দ করেনি। তাদের প্রাইভেসি বিঘ্নিত হয়েছে। আমি একটু অপমানিত বোধ করলাম।

বললাম, আমি যাই এখন জোজোমামা। বড়মামিমা আপনার কথা বলছিলেন। আপনি যদি পারেন তাহলে বিকেলে আসবেন একবার 'ছুটি'-তে। বড়মামি খুব খুশি হবেন।

জোজোমামা বললেন, তাই হবে। তবে তার আগে চিরাইডোংরি যাব। আমি তোমাকে বিকেল চারটেতে গাড়ি পাঠাব। তুমি এলে, আমিও গাড়িতে বসে চিরাইডোংরির দিকে যাব। পুরোটা তো গাড়ি যাবে না। যতখানি যায়, ততখানি গিয়ে বাকিটা আমরা হেঁটে যাব।

তারপর বললেন, নেটো বলছিল, চিরাইডোংরির জঙ্গল এখনও সেরকমই আছে। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হেঁটে গিয়ে সানসেট পয়েন্ট-এ গিয়ে সেখান থেকে পাঁচ বছর আগে তোমার সঙ্গে যেমন দেখেছিলাম, তেমনই সানসেট দেখব। বউদিকে বোলো যে রাতে আমি তোমাদের ওখানেই খেয়ে আসব।

বললাম, ওঁরা যাবেন না? সকলেই তো খাবেন? আমরা 'ছুটি'তে পৌঁছে গাড়ি পাঠিয়ে দেব ওঁদের জন্যে না হয়, যদি ওঁরা হাঁটতে না চান।

না, না, তার দরকার নেই। ওরা একটু একাই থাকতে চায়। তাছাড়া, বউদির সঙ্গে ওদের কম্যুনিকেট করতেও অসুবিধা হবে হয়তো। ওরা হাঁটাহাঁটি পছন্দ করে না এই ধুলোর মধ্যে। কলকাতাতে ফিরে 'জিম'-এ

গিয়ে এক্সারসাইজের অভাবটা পুরিয়ে নেবে। লেট দেম এনজয় ইন দেয়ার ওওন ওয়ে।

যা বলবেন।

আমি বললাম।

তারপর জোজোমামা বললেন, তুমি এখুনি চলে যাবে? চলো না, আমরা পেছনের বারান্দাতে গিয়ে বসি একটু। কফি বা চা খেয়ে যাও এক কাপ। ককটেইল সসেজ খাবে? ওরা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। ভাল পিগারিরি সসেজ। বিয়ারও খেতে পারো, যদি ইচ্ছে করো।

—কখনও সখনও বিয়ার যে খাই না তা না, তবে ইটস টু আর্লি ইন দ্যা ডে। বরং কফি খেতে পারি এক কাপ।

—আমি বললাম।

পেছনের বারান্দায় চলে গেলাম আমরা। পুপু ও আকাশ কোনও উচ্চবাচ্য করল না। আমাদের সঙ্গে যাওয়ার কোনো উৎসাহও দেখাল না, আপত্তিও জানাল না। ওদের এই ইনডিফারেন্সটা আমাকে আহত করল। ঠিক করলাম, আর আসব না এখানে। জোজোমামার জন্যও কষ্ট হচ্ছিল। ছেলে-মেয়ে নিজের মনের মতো না হলে বাবা-মায়ের যে কষ্ট হয় তার ভাগীদার অন্যে হতে পারে না কখনওই। ভাগীদার হবার চেষ্টা করাও উচিত নয়।

পেছনের বারান্দাতে গিয়ে বেতের চেয়ারে বসে জোজোমামা বললেন, তাহলে কয়েক বোতল বিয়ার নিয়ে যাও তুমি । ফ্রিজে রেখে দিও। আছো তো এখানে কিছুদিন? গাড়িতে তুলে দিচ্ছি। অনেক বিয়ার নিয়ে এসেছি আমি। একটু পরই শুরু করবে ওরা ওদের বিয়ার-সেশন।

না, না, তার দরকার নেই জোজোমামা। বিয়ার না খেলেও আমার আনন্দের কিছু ঘাটতি হবে না।

রাতে আমি হুইস্কি নিয়ে যাব সঙ্গে করে। বৌদি জানেন যে, আমি খাই। আমি আর হারীতদা তোমার মামাবাড়ির পেছনের বারান্দাতে বসে, সেখান থেকে চিরাইডোংরি পাহাড়টা আর ঝাঁটি জঙ্গল দেখা যায়, গল্প করতে করতে হুইস্কি খেতাম। চমৎকার কাটত আমাদের সন্ধেবেলা। বৌদিকে আমিই জোর করে জিন বানিয়ে দিতাম অ্যাঙ্গুস্টোরা বিটার্স দিয়ে—পিংক জিন। তোমার মামিমা, মানে, আমার স্ত্রী কেটিও কম্পানি দিত। তোমার মামিমা চলে যাওয়ার পরে হুইস্কির পরিমাণটা আমার অনেকই বেড়ে গেছে। জীবনটা হঠাৎই যেন কেমন উদ্দেশ্যহীন হয়ে গেছে।

তারপর গলা নামিয়ে বললেন, বুঝলে তপু, জীবনটা একটা ভ্যাকুয়াম হয়ে গেছে। মাঝে মাঝেই মনে হয়, ছেলেমেয়ে আমাদের না হলেই ভাল হত। জীবনের সবচেয়ে সুন্দর সময়টা ছেলেমেয়েদের মানুষ করার জন্যে, তাদের ভবিষ্যতের চিন্তাতে আমার তো বটেই, বিশেষ করে তোমার মামিমারও যে ভাবে নষ্ট হয়েছে, তা আমিই জানি। ভারতীয় হিসেবে ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে আমাদের যেটুকু প্রত্যাশা ছিল তার কিছুমাত্রও পূরণ হয়নি। তোমার মামিমা নিজে ইংরেজ হয়েও যত না ইংরেজিয়ানা ছিল তাঁর, আমার ছেলেমেয়েরা তার চেয়েও যেন বেশি বিদেশিভাবাপন্ন হল।

আমি বললাম, আপনার ছেলেমেয়ের দোষ নেই কোনও জোজোমামা। আজকাল একেবারে পাতি পরিবারের ছেলেমেয়েরাও এরকম। ভারতীয়ত্ব, বাঙালিয়ানা এসব যেন ক্রমশই উবে যাচ্ছে। গ্লোবালাইজেশনের এই সস্তা দিকটা আমাকেও অবাক করে। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে তো তিতাস আর আমিও পড়েছি কিন্তু আমাদের মানসিকতা তো একেবারেই অন্যরকম ছিল। ইংরেজি শিক্ষা আমাদের বাঙালিয়ানাকে কোনোভাবেই প্রভাবিত করতে পারেনি।

ওদের কারও কাছ থেকেই আর্থিক সাহায্য তো আমরা চাইনি। চেয়েছিলাম, একটু বিবেচনা, কনসার্ন, বয়স্ক আমাদের জন্য একটু সহমর্মিতা। তার কিছুমাত্রই পাইনি আমরা। তোমার মামিমা প্রায় একমাস নার্সিং হোমে ছিলেন। কেমো চলছিল। পুপু তখন দিল্লিতে মাস-কম্যুনিকেশন পড়ছিল। ওরা বলে "ম্যাসকম"। তার পরীক্ষা ছিল সামনেই। ফোন করলে বলত, এখন গেলে আমার কেরিয়ারটাই নষ্ট হয়ে যাবে বাবা। এখন যাওয়া অসম্ভব। ফোনে তো রোজই খবর নিচ্ছি। তাছাড়া, গিয়ে করবটা কী? নার্সিং হোমে তো তুমি ডে অ্যান্ড নাইট স্পেশাল নার্সও রেখে দিয়েছে।

তোমার মামিমা চলে যাওয়ার পরে সে অবশ্য এসেছিল। ছেলে আর বড় মেয়ে স্টেটস থেকে সৎকারের জন্যে আসবে ভেবে তোমার মামিমার মৃতদেহ অমি তিনদিন মরচুয়ারিতে রেখে দিয়েছিলাম। কিন্তু তারা কেউই আসতে পারল না। মেয়ে বাহামাতে গেছিল ছুটি কাটাতে জামাই ও তাদের দুই যমজ মেয়েকে নিয়ে। আর ছেলের আমেরিকান শাশুড়ি খুবই অসুস্থ হয়ে পড়াতে ছেলে আসতে পারছে না বলে জানিয়েছিল। পুপুই তার মায়ের মুখাগ্নি করেছিল। বড় মেয়ে ও ছেলে জানিয়েছিল মাকে যখন দেখতে পেলাম না তখন আর কাজের সময়ে গিয়ে কী করব! একগাদা

আত্মীয়স্বজনের কাছে এক্সপ্লানেশন দিতে দিতে অ্যানয়েড হয়ে যাব। পয়েন্টলেস হবে যাওয়াটা।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, গৌড়ীয় মঠে শ্রাদ্ধ করেছিলাম। আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধবকে কৈফিয়ত দিতে দিতে আমি নাজেহাল। নিজের সন্তানদের সকলে খারাপ বললে কারই বা ভাল লাগে বলো? নিজে যেদিন বাবা হবে সেদিন এ কথার যাথার্থ্য বুঝবে।

তারপর কফি এলে, কফি খেতে খেতে বললেন, 'মানুষ' হওয়া বলতে তুমি কী বোঝো তপু? আমার সব সন্তানই ব্রিলিয়ান্ট। অসম্ভব কৃতী। ছেলের নাম তো নোবেল-এর জন্যে কনসিডারড হচ্ছে। হয়তো পেয়েও যেতে পারে। কিন্তু তাতে আমার কী লাভ? তোমার চলে-যাওয়া মামিমারই বা কী লাভ?

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, তোমার হয়তো মনে আছে তপু। তুমি তখন তোমার মামিমার মৃত্যুর খবর পেয়ে আমাকে একটি সুন্দর চিঠি লিখেছিলে অয়েল-রিগ থেকে। চমৎকার বাংলা লেখো তুমি, রবীন্দ্রনাথের কিছু কথার উদ্ধৃতিও দিয়েছিলে সেই চিঠিতে। সেই চিঠিটি আমি যত্ন করে রেখে দিয়েছি। চিঠিটা এসেছিল শ্রাদ্ধর প্রায় মাসখানেক পরে।

তারপর বললেন, ভারী গলাতে, ভিজে চোখে, তোমার মতো আমার একটি ভারতীয় ছেলে থাকলে আমি গর্বিত হতাম। আমার বাঁচার ইচ্ছে আর নেই। পিস্তলের এক গুলিতে নিজেকে শেষ করে দিতে পারতাম সহজেই। তাতে ছেলেমেয়েরাই অপদস্থ হত। 'আমার মৃত্যুর জন্যে কেউ দায়ী নয়', এ কথা লিখে গেলেও সকলেই বুঝতো যা বোঝার। তাই হুইস্কি খাই অপরিমিত। শুধু হুইস্কিই নয়। বুঝতে পারছি যে আমি অ্যালকোহলিক হয়ে যাচ্ছি আস্তে আস্তে।

একটু চুপ করে থেকে বললেন, ন্যাচারাল ডেথ হলে তো ছেলেমেয়ের গায়ে কলঙ্ক লাগবে না।

তারপর আমাকে হতবাক করে দিয়ে বললেন, তুমি কি আমার মুখে আগুন দেবে তপু? আসতে পারবে বম্বে থেকে?

আমি স্তম্ভিত হয়ে বললাম, কী যে বলেন আপনি জোজোমামা! এ কথা আর কখনওই বলবেন না। প্লিজ আর কেউই যেন এ কথা না শোনে। তারপরে বললাম, চলুন, বিকেলে আমরা চিরাইডোংরিতে যাব সেই সেবারে যেমন গিয়েছিলাম।

চড়াইডিহির পুজোতে অষ্টমীর দিনে আরতিও দেখব কিন্তু। আর দুপুরে খিচুড়ি খাব, পুজোর প্রসাদ। সেবারেরই মতো।

জোজোমামা বললেন।

ওঁরা যাবে না? মানে, আপনার ছোট মেয়ে আর তার বন্ধু আকাশ?

মনে হয় না যাবে। পুপু একটা রাসকেলকে বিয়ে করছে। ওর সম্বন্ধে আমি দিল্লির বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে খোঁজ নিয়েছি। আকাশ ওর বাবার একমাত্র ছেলে। ওর বাবাও তাঁর বাবার একমাত্র ছেলে। তিনি, মানে, আকাশের ঠাকুর্দা রিয়াল এস্টেটের ব্যবসা করে অনেকই পয়সা করেছিলেন। খুশওয়ান্ত সিং-এর বাবার বন্ধু ছিলেন। তিনি কাজের মানুষ ছিলেন। আকাশের বাবা বিনোদ চোপড়া একটা স্কাউন্ড্রেল। সারাদিন দিল্লি গল্ফ ক্লাবের বার-এ পড়ে থাকে আর জুয়া খেলে। সেই জুয়ার স্টেক-এর কথা শুনলে তুমি অজ্ঞান হয়ে যাবে। ওয়েল-অফফ্ হওয়াটা দোষের নয় কিন্তু ওয়েল অফফ্ বলেই যে বসে বসে অন্ন ধ্বংস করতে হবে তার কোনও মানে নেই। দারিদ্র্য ও বিফলতা মানুষকে অনেক সময়েই ফ্রাস্টেট করে নিঃসন্দেহে কিন্তু সাচ্ছল্য ও সাফল্যও অনেক সময়েই একইভাবে করে। বিনোদ চোপড়া এই রকমই একটা কেস। আকাশ ছেলেটা পড়াশুনোতে ভাল—সেটা হয়তো জিন-এর জন্যে হয়েছে—কিন্তু ভীষণই খারাপ আপব্রিঙ্গিং। তাছাড়া, বিনোদের ওয়াইফ ইজ় আ লেডি অফ ইজি ভার্চু। দিল্লির হাই সোসাইটির সকলেই এ কথা জানেন।

একটু চুপ করে থেকে জোজোমামা বললেন, আমার এসব বলা মানায় না কারণ আমার তো ধারণা আমি আর কেটি আমাদের ছেলেমেয়েকেও অত্যন্ত ভাল শিক্ষা দিয়েছিলাম। কিন্তু তাতে হলটা কী? এই যদি এদের মতিগতি হয়, রুচি হয়, ভ্যালুজ হয় তবে অন্যকে খারাপ বলাটা তো আমার উচিত নয় আদৌ।

কফিটা খাওয়া হয়ে গেলে বললাম, আমি এখন উঠি জোজোমামা। বিকেলে দেখা হবে। আপনি গাড়ি পাঠাবেন না। আমার এখানে এসে হাঁটতে খুব ভাল লাগে। আমি এখানে হেঁটেই চলে আসব। এখান থেকে আপনার সঙ্গে না হয় গাড়িতেই যাব।

জোজোমামা আমাকে 'ছুটি'-র গেট অবধি পৌঁছে দিলেন। পুপু আর আকাশ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, বাই-ই। নাইস মিটিং উ।

আমিও বললাম, বাই। ●



আমার তো ওদের বিশেষ খারাপ মনে হল না। আজকালকার ছেলেমেয়েরা এরকমই হয়। অনেকে একটু অন্তর্মুখীও হয়। কষ্ট করে, নিজেদেরই বানানো একটা ঘেরাটোপের মধ্যে থাকে। সমবয়সী ছাড়া অন্যদের সঙ্গে মিলতে অস্বস্তি বোধ করে। বাইরে মানুষকে মানিয়ে নিতে পারে না, বিশেষ করে যারা গভীর হয় তারা তো একেবারেই পারে না। ওরা প্রেমিক-প্রেমিকা—ওরা যদি একটু একা ও আলগা থাকতে চায়, তাতে দোষের কী?

আমার মনে হল জোজোমামা একটু ওভার-রিঅ্যাক্ট করছেন। হয়তো মামিমার মৃত্যুর পরে ওঁর মনের ভারসাম্যর গোলমাল হয়েছে নইলে আমি তাঁর যতই প্রিয় হই না কেন, পাঁচ বছর পরে দেখা হওয়া বন্ধুর বোনপোকে নিজের ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে এমন মারাত্মক অভিযোগ করাটা আমার স্বাভাবিক বলে মনে হল না।

পথে পড়ে, ভারি ভাল লাগছিল। কত্বদিন যে গান গাই না। চানঘরেও গাই না। গান গাইতে হলে মনের এক বিশেষ অবস্থা লাগে—কেয়ার-ফ্রি অবস্থা। মাথার মধ্যে সবসময়েই কিছু না কিছু চিন্তা থাকেই অথচ সেই সব চিন্তা না করলেও চলত।

জোজোমামা পেছন থেকে ডেকে বললেন, তপু তুমি বিয়ে করোনি এখনও?

আমি মাথা নাড়লাম।

তোমার তো যথেষ্ট বয়স হয়েছে। এখনও করলে না কেন?

হেসে বললাম, করা হয়নি, এই আর কী।

সে কী? তোমার মতো এলিজিবল ব্যাচেলর? হোয়াটস দ্যা প্রবলেম? কলকাতাতে ফিরে তোমার মা-বাবার সঙ্গে কথা বলব।

আমি কিছু না বলে সামনে পা বাড়ালাম। ভাবছিলাম, হোয়াট ইজ জোজোমামাজ প্রবলেম? আমি তো বেশ আছি। বিয়ে করে জোজোমামা যে-সব সমস্যাতে পড়েছেন তা উপলব্ধি করার পরও আমার বিয়ে নিয়ে দুশ্চিন্তা কেন? শুধু আমি একাই বা কেন? একটা সময় আসছে পৃথিবীতে যখন অনেক পুরুষ ও নারীই বিয়ে করবে না। হয়তো আগামী কয়েক বছর লিভ-টুগেদার করবে অনেকে—তারপর আর তাও করবে না। মানুষের ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ এমনই তীব্র হয়ে উঠেছে আজকাল, যে লিভ-টুগেদার করতেও যতটুকু স্বাধীনতা সমর্পণ করতে হয় ততটুকুও আগামী দিনের মানুষে করতে চাইবে না।

আমাদের দেশেও মেয়েরা অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ম্ভর হয়ে ওঠার পরে কোনও পুরুষের উপরে আর্থিকভাবে নির্ভর করার প্রয়োজন তাদের ফুরিয়ে গেছে। তাছাড়া, সময়মতো বিয়ে না করা হয়ে উঠলে বিয়ে করার সাহসেও হয়তো টান পড়ে। ভয় করে বিয়ে করতে। যাই হোক, এখনও যখন বিয়ে করার তেমন তীব্র তাগিদ বোধ করিনি আর করব বলে মনে হয় না। বম্বে এবং কলকাতাতে তিন-চারজন বন্ধু আছে, সমরুচির, সম-মানসিকতার, সামান্য উদবৃত্ত সময়টুকু তাদের সঙ্গে কাটাতেই ভাল লাগে। একসঙ্গে কখনও বেড়াতে যাই বাইরে, ভাল ছবি দেখি, ভাল রেস্তোরাঁতে খাই। শারীরিক আকর্ষণ কখনও কখনও যে বোধ করিনি তাদের কারও প্রতি তা নয়, তবে সেটা স্থায়ী হয়নি কখনও। তারা সবাই উচ্চশিক্ষিত, ভাল পরিবারের এবং স্বনির্ভর।

কাল এখানে আসার পর থেকে শালুকফুলের প্রতি যে এক তীব্র আকর্ষণ বোধ করছি ঠিক তেমনটি আমার কোনও মেয়ে বন্ধুর প্রতি আজ অবধি বোধ করিনি। সেটা কি শুধুমাত্র কাম? না কি, পোষা, পরনির্ভর, বাধ্য ও সুন্দর পাখি বা বেড়ালনিকে মানুষ যেমন করে ভালবাসে তেমনই ভালবাসা এটা? এই বোধটা যে কী, তা আমি নিজেও জানি না। আমার মন বলছে, জোজোমামার দুঃখময় এবং একঘেয়ে স্বগতোক্তি শোনার চেয়ে, তাঁর সঙ্গে

সময় কাটানোর চেয়ে, শালুকফুলের সঙ্গে সময় কাটানোটা আমার কাছে অনেকই সুখকর হবে—বড়মামিমার কাছেও বেশিক্ষণ থাকা হবে।

'ছুটি'-র গেট-এ পৌঁছে হঠাৎই গানটা মনে এল। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলাতে পুজোর আগে গানটা শুনলে পড়াশুনো মাথায় উঠত। মনে হত, সমস্ত শরৎকালটাই বুঝি all its' elements পদ্মফুল আর শালুকফুলও নিয়ে তার সোনার আলো সারা অঙ্গে মেখে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। 'শরৎ আলোর কমলবনে/বাহির হয়ে বিহার করে যে ছিল মোর মনে মনে/তারি সোনার কাঁকন বাজে আজি প্রভাত কিরণ মাঝে/হাওয়ায় কাঁপে আঁচলখানি ছড়ায় ছায়া ক্ষণে ক্ষণে'...

গান গাইতে গাইতে বারান্দাতে উঠলাম। শালুকফুল আমার রাতে পরা জামা আর পায়জামা ধুয়ে মেলে দিচ্ছিল বাড়ির বাঁ পাশের বিস্তীর্ণ পেয়ারাতলিতে। একজোড়া দুগ্গা-টুনটুনি ডাকছিল। তাদের ডাকে এই শরতের উদাস বিধুর এগারোটার বেলা যেন একটি ফ্রেমে বাঁধানো ছবির মতো আমার দু-চোখের মণির মধ্যে সেঁধিয়ে গেল। সেই ছবির ফ্রেমের ঠিক মধ্যেখানে একটি হলুদ রঙা শাড়ি আর কালো ব্লাউজ পরা, পিঠের উপরে কোমরসমান ভেজা চুল ছড়ানো, দুর্দান্ত গড়নের শালুকফুল ফুটে রইল। সত্যি শালুকফুলে গন্ধ থাকে না কিন্তু এই শালুকফুলের ভেজা চুল থেকে সুগন্ধ উড়ছে।

আজকালকার অধিকাংশ মেয়েই চুল ছোট করে ফেলেছে—তেল আর কেউই মাখে না, কেবল শ্যাম্পু। বড় চুল এবং শাড়ি নাকি কাজের পরিপন্থী। কে জানে! ইন্দিরা গান্ধী তো দেশের প্রধানমন্ত্রীত্ব করে গেছেন জিনস বা সালোয়ার-কামিজ না পরেই। চুলটা অবশ্য কেটেছিলেন। তাঁর মুখের গড়নে সেটা মানিয়েও যেত। কিন্তু পদিপিসীর মতো মুখ নিয়ে যে সব মেয়ে চুল ছোট করেন তাঁদের যে কেমন দেখতে লাগে তা কি তাঁরা জানেন? এই সব কর্মবীরা মহিলাদের আমি দূর থেকে প্রণাম করি।

শালুকফুল আমাকে গান গাইতে শুনে মুগ্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইল। মিথ্যে বলব না, এ পর্যন্ত অনেক মেয়েই অনেক সময়ে অনেক জায়গাতেই মুগ্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়েছে। আমি যেমন চেয়েছি অনেকের দিকে মুগ্ধতায় দ্রব হয়ে, কিন্তু তাদের মুগ্ধতার সঙ্গে শালুকফুলের অপাপবিদ্ধ মুগ্ধতার কোনও তুলনা হয় না।

বড়মামিমা বসার ঘর থেকে বারান্দাতে বেরিয়ে এসে বললেন, তপু এলি? জোজো কি আসবে?

—হ্যাঁ বড়মামিমা। আসবেন, হুইস্কি খাবেন এবং রাতে এখানেই খেয়ে যাবেন।

—আর ওর ছোট মেয়ে? ঘেটো বলছিল, পুপু না কী নাম। সে?

—তার সঙ্গে তার এক বন্ধুও এসেছে। পাঞ্জাবি। ছেলে বন্ধু। হয়তো বিয়েও করবে পরে। তবে এখন দুজনেই স্টেটস-এ চলে যাচ্ছে। তবে ওরা আসবে না বোধহয়। মানে, আজ।

—তবে তো ওদের জোড়ে ডেকে অগ্রিম ভাল করে খাইয়ে দিতে হয়। বিয়েই যখন হবে।

—ওসবের মধ্যে যাবেন না বড়মামিমা। এসব প্রথা দেশ থেকে উঠে গেছে। বিয়ের পরেই কেউ খাওয়ায় না আজকাল। তার অগ্রিম খাওয়া। তাছাড়া, তারা একটু একা থাকতে চায় আর যা মনে হল, খুব একটা মিশুকেও নয়। আপনি ডাকলে আপনার অস্বস্তি হবে আর ওদের তো হবেই।

—ঠিক আছে। আছে তো সাতদিন। জোজোকে জিজ্ঞেস করে পরে নেমন্তন্ন করবখন একদিন।

—ওই পাখি দুটো কি দুগ্গা-টুনটুনি বড়মামিমা?

—হ্যাঁ। তুই নাম জানলি কী করে?

—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা পড়ে।

—অ। আমি পাখিদের নাম-টাম জানি না। ও সব জানে শালুকফুল। তবে ও যা নাম বলবে তা তুই কোনও বইয়ে পাবি না। সে সবই স্থানীয় নাম। লাইব্রেরিতে সালিম আলির বই আছে। বইটি বের করে পাখিদের ছবির সঙ্গে মিলিয়ে সব নাম জেনে নে না।

আমি তো অর্নিথলোজিস্ট নই। এত জ্ঞানে আমার দরকার নেই। আমার শুধু ভাললাগাটুকু হলেই চলবে।

—মামিমা তারপর বললেন, খাবি কখন?

—আপনি যখন খান।

—আমি একটাতে খাই। ওয়ান ও ক্লক শার্প। তবে তুই যদি আগে বা পরে খাস তবে তোর সময়েই খাব। আফটার অল, তুই আমার অনার্ড গেস্ট।

—না, না আমিও একটাতেই খাব। যে বাড়িতে যা নিয়ম। আমাদের কলকাতার বাড়িতে ছুটির দিনে আমাদের খেতে খেতে আড়াইটা হয়।

—এখন কী করবি?

—পেছনের বারান্দাতে বসে চিরাইডোংরি পাহাড়ের দিকে চেয়ে থাকব আর ভাবব।

—কী ভাববি?

—আবোল-তাবোল।

—চা-কফি শরবৎ-টরবৎ কিছু খাবি তবু? আধ-বোতল জিন আছে ফ্রিজে। মহীন এসেছিল গত মাসে। কেন যে এসেছিল কে জানে! দিন-রাত শুধু জিন খেয়ে গেল লেবু দিয়ে। বাড়ি থেকে কোথাওই বেরলোই না। গাড়ি নিয়ে এসেছিল টাটা থেকে। তিনদিন পরে আবার গাড়িতে উঠে চলে গেল। কৃষ্ণার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হওয়ার পর থেকে সেই শক-এ মহীন অ্যালকহলিক হয়ে গেছে। মনে হয়।

—জোজো মামার অবস্থাও তো তেমনই দেখলাম। মামিমার মৃত্যুর পরে তিনিও অ্যালকহলিক হয়ে গেছেন। রাতে পেছনের বারান্দাতে বসে হুইস্কি খাবেন বললেন। বড়মামার সঙ্গে যেমন খেয়েছিলেন পাঁচবছর আগে।

—আমার কাছে তো এসব নেই, থাকেও না।

—না না, উনি নিজেই নিয়ে আসবেন। তোমার এখানে যে নেই তা তো উনি জানেনই। থাকার কথাও নয়।

—তুই খাবার আগে জিন খাবি তো বল। শালুকফুল লেবু, বরফ সব গুছিয়ে নিয়ে যাবে ট্রে-তে করে। তোর বড়মামা থাকতেই ওকে সব শিখিয়ে দিয়ে গেছেন নিজে হাত করে।

—আপনি কী খাবেন বড়মামিমা?

—না রে তপু। তোর বড়মামা থাকতে তার সঙ্গে একটু-আধটু খেতাম। এখন ভাল লাগে না। তেমন ভাল অবশ্য কোনওদিনও লাগেনি।

—খেতে যখন দেড় ঘণ্টা বাকি আছে এবং মহীনকাকার প্রসাদও যখন একটু আছে তখন খাই-ই একটু। বললাম, আমি।

—বলেই বললাম, আমি পেছনের বারান্দাতে গিয়ে বসছি বড়মামিমা। আপনিও আসুন না। কাজ তো রোজই থাকবে। আমি তো রোজ থাকব না।

—ঠিক আছে। তুই যা। আমি রান্নাঘরটা একবার ঘুরে যাচ্ছি। এরা সব কিছুই করে কিন্তু ছড়ি না ঘোরালেই সব গোলমাল করে দেয়।

—তারপরই বললেন, তুই নাকি উইনস্টন চার্চিলের কথা বলেছিলি সকালে শালুকফুলকে? একটু আস্তে আস্তে এগো বাবা। বড় গুরুপাক হয়ে

গেল না! সে তো তোর পায়ের কাছে বসে তোকে গুরু করে এই কদিন যা শেখার সব শিখে নেবে বলেছে। এখন তুই চলে গেলে মুশকিল হবে আমার।

—কেন?

—কেন আবার কী? যত নতুন শেখা জ্ঞান সব আমার উপরে ঝাড়বে।

—শালুকফুল ধারেকাছে ছিল না।

বড়মামিমা বললেন, ভীষণ ইন্টেলিজেন্ট আর ওয়েল-ম্যানার্ড মেয়ে। ওর মা-বাবা কেউই নেই। ওঁর দশ বছর বয়স থেকে ওকে আমি আর তোর বড়মামা আমাদের মনের মতো করে মানুষ করেছি। এখানে থেকে তো ভাল স্কুলের এবং কলেজের সুযোগ পেল না কিন্তু তাতে কিছু ক্ষতি হয়নি। আমাদের প্রভাব ওর উপরে এতটাই পড়েছে যে ওর জন্যে পাত্র যোগাড় করাই মুশকিল হচ্ছে। অথচ বিয়ের বয়স তো অনেকদিনই হয়ে গেছে। তবে ওকে ছাড়তেও মন সায় দেয় না। ওদের সমাজে তো তাড়াতাড়িই বিয়ে হয়।

শালুকফুল এখন তোমাদেরই একজন হয়ে গেছে। ও আর ওর নিজের সমাজের নেই।

বুঝলি না, মানুষমাত্রই স্বার্থপর। ও আমার নিজের মেয়ের চেয়েও বেশি। নিজের স্বার্থ বিঘ্নিত হবে বলেই হয়তো ওর বিয়ের জন্যে তেমন চেষ্টাও করছি না। ওর সমাজে, ওর যোগ্য পাত্র পাওয়াও মুশকিল। আই.এ.এস, আই.পি. এস হলেই যে মানুষ হবে এমন তো নয়।

বড়মামিমা বললেন।

ওঁর দশ বছর বয়স থেকে আপনাদের কাছে রয়েছে তো ও। কিন্তু আমি যখন আজ থেকে পাঁচ বছর আগে এসেছিলাম তখন তো ওকে দেখিনি।

দেখিসনি?

না তো।

ওঃ। ফুলকুঁড়ির লুথেরান মিশনের ফাদার টোপনো ওকে নিয়ে গেছিলেন পনেরো দিনের জন্যে। মিশনের স্কুলের মেয়েদের পড়ানোর জন্যে। বোঝো তাহলে, ১৭ বছর বয়সেই দিদিমণি হয়ে গেছিল ও কোনও স্কুল-কলেজের ফর্ম্যাল এডুকেশন ছাড়াই।

ওর বয়স এখন কত?

আমি জিগগেস করলাম।

এখন ছাব্বিশ। ওদের সমাজে তো ষোলো-সতেরোতেই বিয়ে হয়।

বললামই তো আপনাকে, ও তো আর ওদের ওদের সমাজের নেই। ও তো আমাদের সমাজেরই হয়ে গেছে।

—সে কথা ঠিক। সত্যি। শী ইজ অ্যান একস্ট্রা-অর্ডিনারি উওম্যান। –আমার চেয়ে যে বয়সে অনেকই ছোট নইলে আমিই ওকে বিয়ে করে নিয়ে যেতাম।

—তোর মায়ের হার্ট-অ্যাটাক হত। তোর বাবাও তোকে ত্যাজ্যপুত্র করত।

—আমি তো এমনিতেই ত্যাজ্য। নতুন করে ত্যাজ্য করার তো কিছু নেই।

—তাহলে কর বিয়ে। বয়সের তফাতটা কোনও ব্যাপার নয়। মনের যদি মিল হয় সেখানে শরীরের বয়সের অমিলটা কোনও ফ্যাক্টরই নয়। আমাদের ঠাকুমা দিদিমাদের কত বছরের ডিফারেন্স বিয়ে হত? তাঁরা কি অসুখী ছিলেন? আমাদের চেয়ে অনেক বেশি সুখী ছিলেন তাঁরা।

ইতিমধ্যে শালুকফুলকে আসতে দেখা গেল বাগানের দিক থেকে। হলুদ শাড়ির সঙ্গে রঙ মিলিয়ে একগুচ্ছ হলুদ রাধাচূড়া ফুল গুঁজেছে উজ্জ্বল কালো চুলে। নামে তো ওর ফুল আছেই তবে সে ফুল তো সাদা। হলুদ শাড়ি আর হলুদ ফুলে আর কালো ব্লাউজে হলুদ-বসন্ত পাখির মতো দেখাচ্ছে ওকে। 'হলুদ বসন্ত' উপন্যাসের শুরুতে সেই যে একটা কবিতা ছিল না? 'সুখ নেইকো মনে, নাকছাবিটি হারিয়ে গেছে হলুদ বনে বনে'—কবিতাটি কার লেখা তা মনে নেই কিন্তু প্রথম যৌবনে 'হলুদ বসন্ত' আমাদের মনে মনে হলুদ আলো জ্বেলে দিয়েছিল। আজ হলুদবরণ শালুকফুলের মধ্যে ফেলে আসা প্রথম যৌবনের কলেজ-জীবনের হলুদ-রঙা সেই সব উজ্জ্বল প্রেমময় অবুঝ দিনগুলি যেন ফিরে এল।

বড়মামিমা শালুকফুলকে বললেন, ফ্রিজ থেকে মহীনকাকার সেই ফেলে যাওয়া আধ-খালি জিন-এর বোতল, বরফ আর লেবু ট্রেতে করে বারান্দাতে নিয়ে যেতে।

আমি গিয়ে বসলাম বারান্দাতে। 'ছুটি'র পেছনের বারান্দাতে বসে যে দৃশ্য দেখা যায় না তা তুলনাহীনা। যাঁরা ইন্দোরের কাছের রূপমতী আর রাজবাহাদুরের 'মাণ্ডু'তে গেছেন তাঁরা শুধু বুঝতে পারবেন রূপমতী মেহাল থেকে নিমারের আদিগন্ত জঙ্গলাকীর্ণ উপত্যকার কথা বললে। রূপমতী মেহালের গা ঘেঁষে হঠাৎই পাহাড়টা সোজা নীচে নেমে গেছে খাড়া। কমপক্ষে দেড়-দু-হাজার ফিট। দুর্গ তো এমন দুর্গমই হওয়ার কথা। অথবা মনে করা যায়, পালাম্যুর কুরু আর চান্দোয়া-টোড়ির মধ্যের আমঝারিয়া

বাংলোর সামনের উপত্যকার কথা—খাড়া পাহাড়ের পাদদেশ থেকে জঙ্গলাবৃত আদিগন্ত, যে উপত্যকা হাজারিবাগ অবধি চলে গেছে—

চড়াইডিহর উপত্যকাও তেমনই। মুগ্ধ হয়ে বসেছিলাম আমি। ঘন নীল শরতের আকাশ। নীচে রৌদ্রস্নাত হরজাই জঙ্গলে মোড়া উপত্যকা। আকাশে পাহাড়ি বাজ উড়ছে আর উড়ছে শকুনেরা। এত উপরে উড়ছে তারা যে, কালো কালো বিন্দুর মতো দেখাছে তাদের।

শালুকফুল ট্রেটা হাতে করে এসে বারান্দার সেন্টার টেবল-এর উপরে রাখল।

আমি বললাম, এই উপত্যকা শেষ হয়েছে কোথায় গিয়ে, তা জানো? শালুকফুল?

—আমি তো উপত্যকার শেষে যাইনি কখনও। তবে চড়াইডিহর বয়স্কদের কাছে শুনেছি যে এই উপত্যকা শেষ হয়েছে পানুয়ান্না টাঁড়ে গিয়ে। যেখানে হাতিরা তাদের বাচ্চা হওয়ার সময়ে গিয়ে পৌঁছয়। গভীর জঙ্গল আছে সেখানে। বিরাট বিরাট মহীরুহ, যাদের নীচে এমন ছায়া যে, দিনের বেলাতেও অন্ধকার। মেয়ে হাতিরা সেই সব গাছের ছায়াতে প্রসব করে। তখন ওদিকে কেউ গিয়ে পড়লে তার জীবন সংশয় হয়।

—তাই?

—তাই-ই তো বলে গাঁয়ের বুড়োরা।

আমি গ্লাসে এক পেগ মতন জিন ঢেলে নিয়ে, জল লেবু আর বরফ মিশিয়ে বললাম, একবার যাবে? আমি গেলে তুমি যাবে আমার সঙ্গে?

—কোথায়?

—পানুয়ান্না টাঁড়ে।

—সে কতদূর তা কে জানে? কতদিন পায়ে হেঁটে যেতে লাগবে তাই বা কে জানে!

আমি চুপ করে সেই উপত্যকার দিকে চেয়ে বসে রইলাম। ভাবছিলাম, আধুনিক মানুষে, পৃথিবীর তো বটেই, মহাকাশেরও সব রহস্য উন্মোচিত করছে একে একে। তার অজানা, তার অগম্য কিছুই নেই, কোনও জায়গাই আর নেই। তাই. এই প্রেক্ষিতে এই ফুলকুঁড়ি স্টেশনে নেমে পাঁচ মাইল চড়াইতে উৎরাইতে এই চড়াইডিহতে এসে পৌঁছে এখান থেকে পানুয়ান্না টাঁড়ের দিকে চেয়ে একটি অন্তত রহস্যর খোঁজ মিলল যা সবজান্তা মানুষের জ্ঞানে এখনও কলুষিত হয়নি।

ভাবছিলাম, আধুনিক মানুষের জীবনের এই এক অভিশাপ। কোনও রহস্যই আর বেঁচে নেই। সব রহস্যকেই মানুষ নিজে হাতে গলা টিপে মেরে ফেলেছে। জানা অবশ্যই ভাল, কিন্তু সব জানা ভাল কি না, তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। মোহাবিষ্ট লাগছিল আমার। কে জানে! ওই উপত্যকা ধরে গভীর জঙ্গলের মধ্যে মধ্যে হেঁটে গেলে কত গাছ, কত পাখির দেখা পাওয়া যাবে, লোকচক্ষুর আড়ালে বয়ে-যাওয়া কত না কুলকুলানি-তোলা ঝর্না পড়বে পথে।

এই পৃথিবীটা বড় বেশি চেনা আর পুরনো হয়ে গেছে।

তাই অমন জায়গার কথা মনে করলেই মন আনন্দে ভরে ওঠে।

—শালুকফুল বলল, তপুদাদা একটা গান শোনাবেন?

—আমি কি গায়ক? কখনও সখনও চান ঘরেই গাই শুধু। কলতলার জল পড়ার শব্দের অনুষঙ্গে। আমার গান, গান নয়।

—শালুকফুল বলল, মা বলেন, রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'একাকী গায়কের নহে তো গান।' গান যে গায়, সে গান তার যতখানি, যে বা যারা তা শোনে, তাদের তা অনেকই বেশি। আমি এতো গান ভালবাসি কিন্তু গান গাইতে পারি না। ভগবান সবাইকে সব দান দেননি। সকলকে সব দেন না তিনি। কিছু দেন, তো তার চেয়ে অনেক বেশি অদেয় রাখেন।

—বাঃ। ভারি সুন্দর করে কথা বলো তো তুমি শালুকফুল।

—তুমি নিজে ভাল তাই সকলের মধ্যেই ভাল দেখো। এখন কথা থাক, একটা গান শোনাও তপুদাদা।

—শোনাতে হবেই?

হ্যাঁ। হবেই।

আমি গাইলাম, ছেলেবেলাতে মায়ের মুখে শোনা সেই শরতের গানখানি। মা অর্গান বাজিয়ে গাইতেন। সন্ধেবেলা চান করে উঠে পাটভাঙা তাঁতের শাড়ি পরে কটেজ-অর্গানের সামনে বসে গান গাইতেন মা। বাবা গান ভালবাসতেন না। ছেলেবেলা থেকে গান আমার খুব প্রিয় ছিল তাই মা আমাকেই গান শোনাতেন। বাবা তাঁর লাইব্রেরি ঘরে ইজিচেয়ারে বসে হুইস্কি আর সিগার খেতে খেতে সে গান শুনতেন। শুনতেন বটে কিন্তু গানের সঙ্গে একাত্ম হতেন না। বাবার অনেকই গুণ ছিল কিন্তু এই গুণ থেকে, মানে গানের মধ্যে মজে যাওয়ার ক্ষমতা থেকে, বঞ্চিত ছিলেন।

শালুকফুল বলল, কী হল তপুদাদা, গাও না।

'আজি শরৎ তপনে প্রভাতস্বপনে কী জানি পরান কী যে চায়।
ওই শেফালির শাখে কী বলিয়া ডাকে বিহগ বিহগী কী যে গায় গো।
আজি মধুর বাতাসে হৃদয় উদাসে, রহে না আবাসে মন হায়—
কোন কুসুমের আশে কোন ফুলবাসে সুনীল আকাশে মন ধায় গো।

এমন সময়ে বড়মামিমা এসে আমার পাশের চেয়ারে বসে গলা মেলালেন। গাইতে গাইতেই আমি একটা গেলাসে ওঁকে একটু জিন সেজে দিলাম।

—গান শেষ হলে বড়মামিমা বললেন, তুই তোর মামাবাড়ির এই গুণটা পেয়েছিস। গানের মতো জিনিস আছে? মনটা উদাস করে দিলিরে তপু। তোর মা-বাবা যেখানেই যান না কেন প্রতি বছর পুজোর সময়ে তুই চড়াইডিহতেই আসিস। তোর বড়মামা চলে যাওয়ার পরে বড় একা লাগে। এই চড়াইডিহর প্রাকৃতিক আবহে আমি এমনভাবেই জড়িয়ে গেছি যে কোনও শহরে আর যেতে ইচ্ছেই করে না। সেই সব শহরে বড় আওয়াজ, বড় পল্যুশন। ভাগ্যিস শালুকফুলটা ছিল। ও না থাকলে কী করে যে দিন কাটত। সংসারের কাজ আর বই পড়ে সময় আর কাটতে চায় না। একা একা গান গাইতে ইচ্ছেও করে না। তুই গাইলি তাই কতদিন পরে যে গাইলাম আমিও তোর সঙ্গে।

—শালুকফুল বাচ্চা মেয়ের মতো বলল, আরও একটা গাও তপুদাদা। তাহলে তোমার সঙ্গে মাও গাইবে।

—আমি কি সব গান জানি যে ওর সঙ্গে গাইব?

—বড়মামিমা বললেন।

—শালুকফুলের কাজল দেওয়া উজ্জ্বল দুটি স্পন্দিত চোখের তারার দিকে চেয়ে আমার সহকর্মী মাজিদের মুখে শোনা একটি উর্দু শায়েরী মনে এল :

'অ্যাইসা ডুবাহুঁ তেরি আঁখোকি গেহরাই মে,
হাত মে জাঁম হ্যায় মগর পীনেকি হোঁস নেহি।'

অর্থাৎ তোমার চোখের গভীরে আমি এমনি করেই ডুবে গেছি যে হাতে আমার পান পাত্র ধরা আছে কিন্তু চুমুক দিতেই ভুলে গেছি।

মনে মনেই আবৃত্তি করলাম। মনের সব কথাকে বাইরে আনতে নেই।

—শালুকফুল আবারও বলল, গাও না তপুদাদা। কী ভাল গাও তুমি।

—বললাম, বড়মামিমা তোমাকে রবীন্দ্রনাথকেও গুলে খাইয়েছেন কিন্তু এ কথা কি বলেননি যে, রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'ভাল জিনিস অল্প বলিয়াই ভাল।'

—শালুকফুল বলল, না। বলেননি তো এই কথাটি।

—বড়মামিমা হাসছিলেন।

আমি দিগন্তলীন পানুয়ান্না টাঁড়ের দিকে চেয়ে গ্লাসে চুমুক দিলাম। বড় ভাল লাগছিল আমার। মহীনকাকার আধ-খালি জিন-এর বোতল আর এই আবহ, বড়মামিমা আর শালুকফুলের সান্নিধ্য আমাকে পূর্ণ করে তুলছিল আস্তে আস্তে।

তবে পূর্ণ কি কেউই হতে পারে? সারাজীবন চেষ্টা করেও?

ভাবছিলাম আমি। টুকরো-টাকরা নিয়েই আমাদের সকলের জীবন—জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি পথ চলা—পূর্ণতার কামনাতে ভর করে।

কথা না বলে, আমি বারান্দাতে স্থির হয়ে বসেছিলাম।

জোজোমামা, পুপু, আকাশ, মহীনকাকা, বড়মামিমা এবং শালুকফুল এবং তাঁদের সকলের সঙ্গে আমি জীবনের শোভাযাত্রাতে শামিল হয়েছি। কার পথ কোথায় গিয়ে শেষ হবে কে জানে! কিন্তু এই অবিরত চলার আরেক নামই তো জীবন। যার যার সমস্যা সমাধান করতে হবে তাকেই—একা একা—যার যার আশা পূরিত করতে হবে নিজেকেই। কারও অঙ্ক মিলবে, কারও বা মিলবে না। জীবনের নানা আশীর্বাদ আর অভিশাপ সঙ্গে নিয়েই চলতে হবে আমাদের প্রত্যেককে। আমাদের সবাকার জীবনই একটি শেষ না-হওয়া গল্প—সকলের জীবনেই কোনও না কোনও দিগন্তলীন পানুয়ান্না টাঁড় থাকেই—যেদিক পানে চোখ মেলেই আমাদের দিন-মাস-বছর এবং জীবন কাটানো।

হাওয়াটা পাতায় পাতায় মর্মরধ্বনি তুলে বয়ে যাচ্ছিল। নানা গন্ধ উড়ছিল মন্থর বাতাসে। স্ফুট ও অস্ফুট নানান পাখির ডাক। এরই মধ্যে আমরা তিনজন নীরবে বসে ছিলাম দিগন্তলীন পানুয়ান্না টাঁড়ের দিকে চেয়ে।

হোরিয়ালি

ব্যাঙ্গালোরের
রিঙ্কু এবং রঞ্জন ঘোষালকে



বিলাসপুরে ট্রেন থেকে সকালে নেমে ঝিনুক আর ঝাঁজি সাউথ ইস্টার্ন কোলফিল্ড লিমিটেড-এর গেস্ট হাউসে উঠে চান করে ব্রেকফাস্ট করেছে। সুভাষ মামারই ঠিক করে দেওয়া গাড়িতে বেরিয়ে পড়বে 'লামনি' বন বাংলোর দিকে। ওরা দু'জনেই জঙ্গল ভালবাসে বলে এসইসিএলও-র ম্যানেজিং ডিরেক্টর এর পিএ-কাম সেক্রেটারি সুভাষ চৌধুরিই (সম্পর্কে উনি ঝিনুকের মামা হন, মায়ের জ্যাঠতুতো দাদা) লামনি বাংলো বুক করে দিয়েছিলেন। মধুচন্দ্রিমা মানুষ সমুদ্রতীরে, পাহাড়ে বা নামী-দামি ট্যুরিস্ট স্পটেই কাটাতে যায়। কিন্তু ঝিনুক সুভাষমামাকে ই-মেল এ জনিয়েছিল যে একটা অখ্যাত, নির্জন, অফবিট বন বাংলো বুক করে দিও। সুভাষমামা এবং ওঁর ছেলে বুলেট স্টেশনে এসেছিলেন ওদের রিসিভ করে গেস্ট হাউসে নিয়ে যেতে। একেবারে ফাইভ স্টার হোটেলের মতো গেস্ট হাউস। আমাদের দেশের পাবলিক সেক্টর কেরনিগুলিও বিলাসিতাতে কম যায় না। তা তারা লস-এই চলুক কী প্রফিটে। তবে এস সি সি এল প্রফিটেই চলে বলে শুনেছে।

ওরা দশটা নাগাদ রওনা হবার আগেই মামিমাও তাঁর কলেজ যাওয়ার পথে ওদের সঙ্গে দেখা করে টা-টা করে গেলেন। মামিমা বিলাসপুরেরই এক কলেজের অধ্যাপিকা। বললেন, লামনিতে না গিয়ে তোরা অচানকমার-এ

গেলেই পারতিস। লামনি বাংলোর চেয়েও সেটা নির্জন। এবং বড় রাস্তা থেকে একটু ভিতরে।

কী নাম বললে, মামি?

নাম শুনে অবাক হয়ে ঝিনুক বলেছিল।

অচানকমার।

জায়গার নাম অচানকমার?

হ্যাঁরে! দেশটার নাম ভারতবর্ষ। এ যে সত্যিই বিচিত্র দেশ!

সুভাষমামা বললেন, আমি কনসার্ভেটর সাহেবকে বলে রাখব। যদি ও বাংলো খালি থাকে আর তোদের পছন্দ হয় তা হলে ওখানেও তোরা থাকতে পারিস। তবে আপাতত লামনিতেই গিয়ে ওঠ। পরে না হয় অচানকমারে এসে থাকিস। লামনির পথেই পড়বে অচানকমার। যাওয়ার সময়ে ইচ্ছে করলে সে বাংলো দেখেও যেতে পারিস। তার পর পছন্দ হলে, পরে এসে থাকিস। আজ থেকেও থাকতে পারিস। শীতকালে ভিড় থাকে। বছরের এই সময়ে বাংলো ফাঁকা থাকার সম্ভাবনাই বেশি।

কতদিনের ছুটি নিয়ে এসেছিস তোরা? মামিমা জিজ্ঞেস করলেন।

ছুটি কি পাওয়া যায়? সাতদিনের ছুটি। আমার তো অসুবিধে ছিল না লম্বা ছুটি নিতে, ঝাঁজিরই অসুবিধে। এখন তো আর ইংরেজ জমানা নেই। ইংরেজরা অনেক সুসভ্য জাত ছিল। দশটা-পাঁচটা অফিস। প্রয়োজনে দীর্ঘ ছুটি। এখন তো অ্যামেরিকান জমানা। হায়ার অ্যান্ড ফায়ার। সকাল আটটা থেকে রাত আটটা কাজ আর শনি-রবি গারদ থেকে ছাড়া পেয়ে পাগলের মতো অবস্থা। কতরকম কাজ থাকে। ভাল্লাগে না।

ওদের মালপত্র সব গাড়ির বুটে তোলা হয়ে গিয়েছিল। দু'জনে দুটো ছোট ব্যাগ এনেছে আর দু'জনের জামাকাপড়ই টিনের একটি বড় তোরঙ্গে নিয়ে এসেছে। তোরঙ্গটি বিয়েতে উপহার দিয়েছেন ঝিনুকের ব্যাচেলর কাকা। টিনের তোরঙ্গটি সাদা রং করা। তার উপরে কালীঘাটের পটুয়াকে দিয়ে আঁকানো নানা ফুল পাতা। লাল নীল হলুদ সবুজ রঙা। আর ডালাটার উপরে পোস্ট-অফিস রেড দিয়ে বড় বড় করে বাংলাতে লেখা : "সুখে শান্তিতে ঘর করো, তুই-তোকারি বন্ধ করো।"

তোরঙ্গটি দেখে সুভাষমামা আর মামিমা হেসে বাঁচেন না। মামিমা বললেন, তুই-তোকারির মধ্যে প্রেম কি বাঁচে? বিয়ের পরও তোরা তুই-তোকারি চালিয়ে যাচ্ছিস?

কী করব মামি। অভ্যেস হয়ে গেছে।

হাসতে হাসতে ঝিনুক বলল।

ঝাঁজি বলল, মামিমা, প্রেম কচুরিপানার মতো। যদি সে কোথাও সতিই থাকে তবে তার ক্রমশই বাড়-বাড়ন্তই হয়। তাকে মারতে চাইলেও মারা যায় না। সে অজর, অমর।

মামিমা ঝিনুকের থুতনি ছুঁয়ে আশীর্বাদ করে নিজের আশীর্বাদী আঙুলে চুমু খেয়ে বললেন, আহা! তাই যেন হয়। জীবনটা বড় লম্বা দৌড় রে, বিশেষ করে বিবাহিত জীবন, সেই দৌড়ে তোরা যেন শেষ অবধি হাতে-হাত ধরে দৌড়ে যেতে পারিস। তুই-তোকারি করেও যদি যেতে পারিস তাতেও ক্ষতি নেই।

এবারে যেতে দাও ওদের। দেরি হয়ে যাচ্ছে। অনেকখানি পথ যেতে হবে।

সুভাষমামা বললেন।

যুবতী মামিমা বললেন, প্রাচীনাদের মতো, যাওয়া নেই, এসো। অমরকণ্টক যেতে ভুলো না যেন। তোমার মামার কোম্পানির ওখানকার গেস্ট হাউসটাও খুব ভাল। আর তামিল কেয়ারটেকার আর তার বউ যা দোসা বানায় না! ভূ-ভারতে তার জুড়ি পাবে না।

ঝিনুক হাসতে হাসতে বলল, তবে তো যেতেই হবে। সুভাষমামা চিঠিও দিয়ে দিয়েছেন, ফোনে বলেও দেবেন। বলেছেন।

এবারে এগোও। এনজয় করো। জীবনকে চেটেপুটে খাও। যৌবনের চেয়ে বড় দান ঈশ্বর মানুষকে আর কিছুই দেননি। আর দম্পতিদের মধুচন্দ্রিমার চেয়ে ভাল সময় আর কী আছে?

—তাই?

ঝিনুক বলল, লজ্জা-রাঙা মুখে।



দিল্লি কলকাতা চেন্নাই মুম্বইতে যা ভাবাই যায় না তা এই বিলাসপুরের মতো জায়গাতে ঘটে। দশ মিনিটের মধ্যেই শহরের ইটকাঠের ঘেরাটোপ ছেড়ে উন্মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে এসে পড়া যায়। জঙ্গল এখনও শুরু হয়নি। কিন্তু প্রকৃতি আদিগন্ত, খোলামেলা রয়েছে পথের দু'দিকে। নীল আকাশ। শরৎ এখনও আসেনি তবে আসব আসব করছে। আজকাল তো আর মল মাস-টাস নেই—যখন তখন বিয়ে করছে মানুষ রেজিস্ট্রি করে। মানুষ এতই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে তার কাজে, তার কেরিয়ারে, উন্নতির চেষ্টাতে, তার বাড়ি গাড়ি ফ্রিজ টিভি এসি ইত্যাদির সাধনাতে যে বিয়ে করার সময়টুকুও বের করা মুশকিল। বিয়ে যদিবা করবার সময় পাওয়া গেল তো সন্তানের জন্ম দেওয়ার সময় আর পাওয়াই যাচ্ছে না। ওইসব ছুট-ঝামেলাতে যাওয়ার সময়ই নেই প্রায় কারওরই।

ঝিনুক ঝাঁজির পাশে ঘন হয়ে বসেছিল। গাড়ির পিছনের সিটে মারুতি জেন গাড়ি।

আসবার সময়ে হাওড়া থেকে বম্বে মেইল ভায়া নাগপুরের এসি ফার্স্ট ক্লাস-এর ক্যুপের টিকিট কেটেছিল। হানিমুন-এর জন্যে চাকরিতে ঢোকার পর থেকেই আলাদা করে টাকা জমিয়েছিল ঝাঁজি। দরজা বন্ধ করে ক্যুপের বার্থ-এ নবপরিণীতা স্ত্রীকে রমণ করতে কেমন অনুভূতি হয় তা জানার এক উগ্র ইচ্ছা ছিল কলেজে পড়ার দিন থেকেই। যখন ক্যুপ-এর দরজা বন্ধ করে

নীল আলো জ্বেলে ঘটনাটা ঘটাল ঝাঁজি তখন ঝিনুক ব্যাপারটাকে প্রচণ্ডভাবে উপভোগ করতে করতে মেয়েসুলভ ন্যাকামির সঙ্গে অস্ফুটে বলেছিল, তুই একটা অসভ্য।

এই "অসভ্য" শব্দটা মেয়েদের মুখে শুনতে ভারি ভাল লাগে ঝাঁজির, সেই প্রথম কৈশোর থেকেই। ঝিনুকের মুখে তো অবশ্যই। মেয়েদের মধ্যে ন্যাকামি সে খুবই পছন্দ করে বলেই ঝিনুকের সঙ্গে সাউথ পয়েন্টে একসঙ্গে পড়বার সময় থেকেই ওকে ভাল লেগেছিল। তা ছাড়া, সৌন্দর্য, মেধা, বুদ্ধির দীপ্তি এসব তো ছিলই।

ঝিনুকের ঐ মন্তব্যের উত্তরে ঝাঁজি রমিতা ঝিনুকের ঠোঁটের উপরে তার ঠোঁট চেপে বলেছিল, চুপ কর। কথা বলিস না এখন। এখন শরীর শরীরের সঙ্গে কথা বলছে।

ঝিনুক ভাবছিল, পড়েছিল বটে, রাধার ভক্তি, 'প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।' বাক্যটার মানে এই আঠাশ বছরে পৌঁছে এখন বুঝতে পারছে। চারদিন মোটে হয়েছে ওদের বিবাহিত জীবনের বয়স। ঝাঁজির বড় আদর খেতে খেতে ঝিনুকের চোখের কনীনিকা দুটি আস্তে আস্তে লাল হয়ে আসছিল, ও নিজে দেখতে পাচ্ছিল না, তবে ঝাঁজি দেখতে পাচ্ছিল।

ঝিনুক ভাবছিল, মেয়েবেলা থেকে অনেক কথাই আজ অবধি পড়েছে, শুনেছে, কিন্তু তার মানে বোঝেনি। ভাবছিল, জীবনে অনেক কিছুই থাকে যা শুধুমাত্র নিজের জীবন দিয়েই, শরীর দিয়েই, মন দিয়েই অনুভব করতে হয়। পরের মুখের ঝাল খেয়ে তা কখনওই অনুভব করা যায় না। ●



বিলাসপুরের কিছু পর থেকেই জঙ্গল শুরু হল। একটি জনপদে পৌঁছল এসে। ড্রাইভারের নাম ঘাসীরাম পোর্তে। তাকে জনপদের নাম জিজ্ঞেস করাতে সে বলল, কোটা। এ কোটা দিল্লির কাছের কোটা নয়। সে কোটা বিখ্যাত কোটা। ঘাসীরাম বলল, কোটাতে রেললাইনও আছে। সেখান থেকে লাইন একদিকে গেছে ঘুটুতে আর অন্য একটা লাইন চলে গেছে বেলখানা হয়ে খঙ্গসোরাতে।

আরও বেশ কিছুক্ষণ পরে ওরা শেওতারাইতে এসে পৌঁছল। সেখানে দোকানবাজার আছে। এর আগে-পরে বেশ অনেকগুলি বাংলোও দেখা গেল। বনবিভাগের কিনা বোঝা গেল না। মনে হল, এখানে বনবিভাগের অফিসও আছে। ঘাসীরাম তাদের অনুমান যে ঠিক তা বলল।

দুপুর গড়িয়ে যখন বিকেলে পৌঁছল তখন ওরাও অচানকমারে এসে পৌঁছল। পথের বাঁ-দিকে একটি চায়ের দোকান। তার পাশেই হাটের নানা দোকান। আজ হাট নেই। সব দোকানই ফাঁকা। দোকানের দরজা নেই। পাটাতনের মতো করা আছে বাঁশের। হাটের দিনে মাটিতে এবং এইসব দোকানে গ্রামের মানুষেরা পসরা নিয়ে এসে বসে। আনাজপাতি, ছাগল-পাঁঠা, মুরগি, জামাকাপড়, প্লাসটিকের জুতো, চিরুনি, চুড়ি, রিবন, গন্ধ তেল, বাসনপত্র ইত্যাদি, ঘাসীরাম বলল।

পথের ডানদিকে একটি বড় বস্তি। ঘাসীরাম বলল, বাইগাদের বস্তি। এ দিকে গোন্দ আর বাইগারাই বেশি। পানকা নামের এক উপজাতিও থাকে। তবে তারা সংখ্যাতে কম।

দোকানটাতে গরম গরম সিঙাড়া ভাজছিল।

ঝাঁজি বলল, খাবি নাকি?

পথের খাবার খাওয়াটা কি ঠিক হবে? কী কুকিং মিডিয়ামে রেঁধেছে কে জানে!

এই জন্যেই তোরা অন্যরকম রয়ে গেলি। হেল্‌থ-কনসাস, ক্লাস-কনসাস। আমি তো পথে বেরিয়ে পুরনো মোজাতে ছাঁকা চামড়ার গুঁড়ো মেশানো গুঁড়ো চা দিয়ে বানানো চা বেশি করে দুধ-চিনি দিয়ে খেয়ে খুব মজা পাই। আর সঙ্গে ট্রাকের পোড়া মবিল-এর পোড়া তেলে ভাজা সিঙাড়া জিলিপি। সে সবের স্বাদই আলাদা। এই সব যথার্থ ভারতীয় ব্যাপার-স্যাপারের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে না পারলে কলকাতার বাড়ির ঘেরাটোপ ছেড়ে আসাই-বা কেন? দাঁড়ের ময়না না হয়ে থেকে বনের পাখি হ এবারে ঝিনুক।

—তুই সত্যিই এসব খাস, না ঠাট্টা করছিস?

—সত্যিই খাই। তুইও খা। দেখবি কী স্বাদু।

এক বুড়ো বসে মস্ত কড়াইতে তেল ঢেলে সেই ফুটন্ত তেলে সিঙাড়া ছাড়ছিল। আর তার পাশে একটি বাইশ তেইশ বছরের শ্যামলা মেয়ে বসে বসে সিঙাড়া গড়ছিল। তার পাশে একটি দেড়-দু'বছরের দুরন্ত উলঙ্গ শিশু দু'হাতে মুঠো মুঠো ধুলো নিয়ে বিকারহীনভাবে মুখে পুরছে। সেই মেয়েটি, সম্ভবত ছেলেটির মা, আর বুড়োও নির্বিকারভাবে নিজের নিজের কাজ করে যাচ্ছে।

—সাহেব মেমসাহেব কি গাড়ি থেকে নেমে দোকানের সামনে পাতা কাঠের তক্তাতে বসে খাবেন, না গাড়িতে বসেই খাবেন?

কী মনে করে ঝিনুক বলল, চল, নামি। অনেকক্ষণ একটানা বসে আছি। একটু রক্ত সঞ্চালন করা দরকার।

ঝাঁজি বলল, যা বলিস তুই। নতুন বউ বলে কথা। তবে এত বাধ্যতাও ভাল নয়। পরে অবাধ্য যে হবি সে বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই।

ঝিনুক জবাবে কিছু না বলে অপাঙ্গে একবার চাইল ঝাঁজির মুখে।

ঘাসীরাম বলল, এই চায়ের দোকানের মালিক বুড়োর নাম দশরথ। ওর মেয়ে ওকে সাহায্য করে। মেয়েটির নাম কৌশল্যা। ওর বর ওকে ছেড়ে চলে গেছে দিনদৌরিতে। সেখানে ঘর বেঁধেছে অন্য মেয়ের সঙ্গে।

ঝিনুক বলল, দশরথের মেয়ের নাম কৌশল্যা কী করে হয়? পুত্রবধূ মেয়ে হয়ে গেল!

ঝাঁজি বলল, হলেই হয়।

—তুমি এতসব জানলে কী করে ঘাসীরাম?

—আমি তো এই অঞ্চলেরই মানুষ সাহেব। আমার বাড়ি তো লামনিতেই। আমিও আদিবাসী। গোন্দ। লামনির গোন্দ বস্তিতেই আমার বাড়ি। বউ ছেলেমেয়ে সেখানেই থাকে।

—দিনদৌরি জায়গাটা কোথায়?

—অমরকণ্টক থেকে যেতে হয়। পেন্ড্রা রোড স্টেশন থেকেও বাসে যাওয়া যায়।

ঝাঁজির ঘোর লেগে গেল। কত সব নতুন নতুন জায়গা। কত অজানা মানুষ—অজানা অরণ্যময় জগতের বাসিন্দা তারা। সত্যিই ঘোর লেগে যাচ্ছে। কত নাম। নামের নামাবলি।

চা-সিঙাড়া খাওয়ার পরে ঝিনুক বলল, বনবাংলোটা দেখবি না?

—নিশ্চয়ই। চলো ঘাসীরাম, বনবাংলোটা দেখে নিই।

ঝাঁজি বলল।

ঘাসীরাম বাঁ-দিকের পথে গাড়ি ঢোকাল। কিছুটা গিয়েই একটা কাঠের বাংলো দেখতে পেল ওরা। কটেজ বলাই ভাল বাংলো না বলে। কোনও ছবিতেও দেখেনি আগে এমন কটেজ। চার পাশে বারান্দা, মধ্যে দুটি ঘর। একটি ছোট একটি বড়। তাতে কাঠের বিছানা। পিছনের বারান্দাটা চওড়া। তার একটু পরই জঙ্গল। এ বাংলোর কোনো ঘরেরই আগল নেই। বারান্দা থেকে ঘরে ঢোকার দরজাতেও কোনও খিল-টিলও নেই। ঘরের কোনও প্রাইভেসিও নেই। কাঠের টুকরো-টাকরা দিয়ে তৈরি দেওয়াল ফাঁক-ফোকরে ভরা। চানঘরের অবস্থাও সেইরকমই। কোনও চৌকিদারকেও দেখা গেল না। জলের কী বন্দোবস্ত এখানে তাও বোঝা গেল না। ঘাসীরাম বলল, এখানে কেউই থাকে না। মেয়েদের থাকার মতো আব্রুও নেই। কখনও সখনও পুরুষেরা দল বেঁধে এসে ছুটির দিনে পিকনিক করে যায় শীতকালে।

—এখানে থাকা গেলে বেশ হত না রে?

ঝিনুক বলল।

--তোকে নিয়ে এখানে থাকা যাবে না।

ঝাঁজি বলল।

তারপর বলল, এতদিন কোনও মহিলার সঙ্গে তো কোথাওই যাইনি। মহিলা সঙ্গে থাকলে যে কত হ্যাপা এইবারে বুঝতে পারছি।

ঝিনুক বলল, আমি তা হলে তোর লায়াবিলিটি বল?

—লায়াবিলিটি না বলে বলব রেসপনসিবিলিটি। মেয়েরা সঙ্গে থাকলে হুট-হাট করে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। সব ব্যাপারেই ভাবনা-চিন্তা করতে হয়, বিশেষ করে আমাদের দেশে। আমরা যে এখনও সভ্য হয়ে উঠিনি। ল অ্যান্ড অর্ডারের কথাও ভাবতে হয়। সুইটজ্যারল্যান্ড বা অস্ট্রিয়া বা ইংল্যান্ড বা স্টেটস হলে এমন কটেজেই স্বচ্ছন্দে থেকে যাওয়া যেত দু'জনে। চোর ডাকাত রেপিস্ট—কোনও কিছুর চিন্তাই করতে হত না। পুরো দেশে সভ্যতার একটা বাতাবরণ তৈরি না হলে এদেশে মেয়েরা কখনও যথার্থ স্বাধীন হবে না তা তোদের শহুরে নারীবাদীরা যতই চেঁচামেচি করুন না কেন।

—কথাটা ঠিকই বলেছিস। শেষে আমি তোর দায় হলাম।

—তা হলি। তবে দোষটা তোর নয়, দোষটা আমাদের দেশের।

—অন্য বাংলোটা দেখবি না?

—নিশ্চয়ই।

ওরা ঐ কাঠের কটেজ ছেড়ে বেরিয়ে এসে ঘাসীরামকে বলল, চলো, অন্য বাংলোটা দেখি পোর্তে।

ঘাসীরাম নামটা বেশ বড় তাই ঝাঁজি ওকে পোর্তে বলেই ডাকবে ঠিক করল।

অন্য বাংলোটা এ বাংলো থেকে কিছুটা দূরে। এটা অবশ্যই বাসযোগ্য বাংলো। গাড়ি দেখে চৌকিদার দৌড়ে এল।

—খালি আছে?

চৌকিদার বলল, এখন খালি আছে। তবে আজই বিকেলে বিলাসপুর থেকে ফরেস্টের ডি-এফও সাহেব আসবেন। বউ আর শালী নিয়ে আসছেন। রাতটা কাটিয়েই চলে যাবেন অমরকণ্টকে। শেওতারাই থেকে রেঞ্জার সাহেব আমাকে আপনাদের কথা জানিয়ে খবর পাঠিয়েছেন—বিলাসপুর থেকে কনসার্ভেটর সাহেব ফোন করেছিলেন নাকি। আপনারা আজ লামনিতে রাত কাটিয়ে কাল সকালেই এখানে চলে আসতে পারেন।

—বাংলোর ভিতরটা দেখতে পারি?

—নিশ্চয়ই।

চৌকিদার যখন ওদের ঘরের ভিতরে নিয়ে গেল অবাক হল ওরা। প্রায় অ্যান্টিক হয়ে যাওয়া ডাবল বেড খাট আর তার উপরে টানা পাখা। মাদুরের তৈরি। ঘরের সিলিং থেকে বাঁশের সঙ্গে বাঁধা, লাল শালুর ফ্রিল দেওয়া।

—ঝিনুক অবাক হয়ে বলল, এটা কী রে?

—এটা সিলিং ফ্যান। সাহেবদের আমলে তৈরি। মধ্যপ্রদেশের এইসব জঙ্গলে সাহেব-সুবোরা শিকারে আসতেন—ডিএম, এসডিওরা কাজে আসতেন। তখন তো বিজলি ছিল না। ওই দ্যাখ দেওয়ালে একটা ফুটো আছে। এই পাখার উপরের বাঁশের ডান্ডার সঙ্গে দড়ি বাঁধা থাকত আর পাঙ্খা পুলারে ঘরের বাইরের বারান্দার টুলে বসে সেই দড়ি ধরে টানত লাগাতার। তাই তাদের নাম ছিল 'পাঙ্খা পুলার'। দিনে রাতে দু'শিফট-এ কাজ করত তারা।

—তুই এত জানলি কী করে?

—দাদুর কাছে শুনেছি। আমার দাদু তো পুলিশের এস.পি. ছিলেন। ট্যুরে যেতে হত তাঁকে অনেক জেলা সদরে। থাকতেন সার্কিট হাউসে। দাদু অনেক গল্পই করতেন। দাদুর কথা মনে পড়ে গেল এই টানা পাখা দেখে।

—দাদু কবে চলে গেছেন?

—সে অনেকদিন। আমি তো সাউথ পয়েন্টে ভর্তি হই ক্লাস ফোর-এ। তুইও তো সে বছরেই ভর্তি হোস। তাই না?

—হ্যাঁ। তোর বাবা, মানে মেসোমশাই এরই মতো আমার বাবারও তো বদলির চাকরি ছিল। কলকাতাতে এসে থিতু হবার পরেই ওখানে বাড়ি করেন। দাদুর যখন মৃত্যু হয় তখন আমার দশ বছর বয়স। জীবনে সেই প্রথম মৃত্যু দেখি আমি।

চৌকিদারকে ঝাঁজি জিজ্ঞেস করল, এইসব জঙ্গলে কী কী জানোয়ার আছে?

—সব জানোয়ারই আছে। তবে হাতি গণ্ডার নেই। সবরকম হরিণও নেই। সম্বর, বারাশিঙ্গা, কোটরা, চিতল হরিণ এসব অনেক আছে। বড় বাঘ, চিতা, বুনো কুকুর এসবও আছে। ময়ূর, মুরগি, তিতির বটের এবং আরও নানা পাখি আছে। এই পুরো অঞ্চলই তো এখন অভয়ারণ্য হয়ে গেছে।

—অভয়ারণ্য? কী নাম?

ঝিনুক চোখ বড় বড় করে শুধোল।

—অচানকমার।

—অভয়ারণ্যের নাম অচানকমার?

—হ্যাঁ মেমসাব।

—নদী নেই?

—আছে তো।

—কী নদী?

—মানিয়ারি কৈরাহা।

—বাঃ! ভারি সুন্দর নাম তো।

—কাল আপনারা আসুন সাহেব মেমসাহেব। আমি নিজে সঙ্গে করে নিয়ে যাব সব জায়গাতে। ভাল করে দেখাশোনা করব আপনাদের। আমার গরুও আছে। গরুর টাটকা দুধ খাওয়াব। যা বলবেন, তাই-ই রেঁধে দেব। মুরগি, পাঁঠা, শুয়োর।

—শুয়োরও পাওয়া যায় এখানে? জংলি শুয়োর?

—জঙ্গলে শুয়োর অনেক আছে—ঝুণ্ডকা ঝুণ্ড। তবে সে শুয়োর তো মারা বারণ। তবে হাটে ওঠে শুয়োরের মাংস। এখানের বস্তির শুয়োর তো জঙ্গলেই চরা-বরা করে খায় তাই স্বাদে তাদের মাংস বুনো শুয়োরেরই মতো ভাল।

ঝিনুক বলল, শুয়োর খাবি না কি তুই? খাস না। টেপ ওয়ার্ম হবে। মণিদির বর তপনদা কতদিন ভুগল দেখলি না?

—কে তপনদা?

—আরে তপন মল্লিক—ভবানীপুরের।

ঝাঁজি বলল, দুস্। এ কী বস্তির গু-খাওয়া শুয়োর ভেবেছিস না কি? এরা তো বন্য বরাহরই মতো। স্বয়ং রামচন্দ্রও খেতেন যখন দণ্ডকারণ্যে থাকতেন। শুয়োর খাওয়ার এমন সুযোগ পেলে কেউ ছাড়ে? বড়মামার সঙ্গে একবার দানুয়া-ভুলুয়ার জঙ্গলে গিয়ে খেয়েছিলাম। বড়মামা তো শিকারী ছিলেন। তিনিই শুয়োর মেরেছিলেন। নিজে হাতে ভিন্ডালু রেঁধেছিলেন। এখনও স্বাদ মুখে লেগে আছে। সেবার একটা চিতাবাঘও মেরেছিলেন। নানা ছুটিতে বড়মামার সঙ্গে আমি নানা জঙ্গলে গেছি। তবে আমার বাবা ঘোর শিকার-বিরোধী ছিলেন এবং এখনও আছেন। বলেন, তোর বড়মামার মতো মানুষরাই তো জানোয়ার মেরে জঙ্গল সাফ করে দিলেন। তবে আমি জানি যে, বড়মামা পারমিট নিয়েই শিকার করতেন এবং

কখনওই আইন অমান্য করতেন না। আমার এই জঙ্গলপ্রীতি এসেছে বড়মামার সঙ্গে নানা বনে ঘুরে ঘুরেই। আমার তো নয় কারণ ছিল, তুই এত জঙ্গল পাগল কেন?

ঝিনুক বলল, মেয়েবেলা থেকে ঋজুদার গল্পগুলো পড়ে পড়ে।

—তাই? আমি বিশেষ পড়িনি।

—খুব মিস করেছিস।

—এখানে কথা না বাড়িয়ে চল লামনিতে যাই। নতুন জায়গা।

—সন্ধের আগে আগে গিয়ে পৌঁছতে না পারলে থাকা ও খাওয়াদাওয়ার বন্দোবস্ত করতে অসুবিধে হবে।

ঝিনুক বলল, তুই যা বলবি। তুই তো এখন আর ক্লাস-ফ্রেন্ড নোস, আমার পতিদেবতা। তোর কথা তো মানতেই হবে।

—বেশি ঢঙ করিস না। শাশুড়িকে মাসিমা, শ্বশুরকে মেসোমশায় বলিস, বউই বটে!

—তুইও তো আমার মা-বাবাকে মাসিমা-মেসোমশাই বলিস।

—তা বলি অবশ্য। দিনকাল বদলে গেছে।

চৌকিদারকে কাল আসতে পারে বলে ওরা দু'জনে গাড়িতে উঠল।

পোর্তে গাড়ি স্টার্ট করে কাঁচা রাস্তা দিয়ে এগিয়ে গিয়ে পিচরাস্তাতে পড়ল।



ঘোড়ার নালের মতো একটা বাঁক নিয়েছে পথটা লামনি বাংলোর সামনে দিয়ে, তার পর একটা ছিপছিপে নদীর উপরের ব্রিজ পেরিয়ে চলে গিয়েছে কেঁওচির দিকে। কেঁওচি থেকে এসইসিএল-এর কয়লা খাদান সুহাগপুরে পথ গিয়েছে। সোজা অমরকন্টকে যেতে হলে কেঁওচি থেকে বাঁ-দিকে ঘুরতে হবে। সুভাষমামা বলে দিয়েছিলেন।

কেঁওচিতে বঁড়িয়া ধাবা আছে। যা খেতে চান তাই পাবেন। পোর্তে বলল।

—নদীটার নাম কী?

—মীট্টি নালা।

ঘাসীরাম পোর্তে মানুষটা গাড়ি বেশ ভালই চালায় কিন্তু দোষের মধ্যে বড় বেশি কথা বলে। তবে ছেলেবেলার বন্ধু এবং তারই সঙ্গে নববিবাহিত দম্পতি হিসাবে মারুতি জেন-এর পিছনের সিটে ঘন হয়ে বসে পোর্তের বকবকানি শুনতে খারাপ লাগছিল না। শুক্লপক্ষের চাঁদনি রাত জঙ্গলে উপ্‌ভোগ করবে বলে এসেছিল কিন্তু একটু আগে থেকেই অসময়ের বৃষ্টি শুরু হয়েছে। হালকা বৃষ্টি। গাড়িতে এসি থাকলেও ওরা কাচ একটু নামিয়েই এসেছে বিলাসপুর থেকে। বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব। বড়মামা বলতেন, মাটির গন্ধ, গাছের গায়ের গন্ধ, পাতার গন্ধ, ফুলের গন্ধই যদি না উপভোগ করলি

তবে জঙ্গলে আসা কেন! জঙ্গলে গেলে বড়মামা তাঁর নিজের জিপ নিয়েই যেতেন। তখনকার জিপে এসি তো ছিল না, তাই এসি চালানোর প্রশ্নই ছিল না। এখন তো সবরকম গাড়িতেই এসি।

বৃষ্টি-ভেজা বাঁশবন এবং অন্য নানা গাছগাছালির গায়ের গন্ধ ভাসছে ভিজে হাওয়াতে। ভারি ভাল লাগছে। পাশে বসা আস্ত একটি মানুষের মালিকানা, তার শরীর ও মনের সবটুকু শুধু যে শুধুমাত্র তারই একার এ কথা মনে করেই ঝিনুক আর ঝাঁজি দু'জনেই শিহরিত হয়ে উঠছে।

লামনি বাংলোতে পৌঁছেই খুব ভাল লেগে গেল ওদের দু'জনেরই। সামনেই দুটি প্রাচীন বটল-ব্রাশের গাছ। একটা সুপ্রাচীন মহীরুহ।

এটা কী গাছ? জিজ্ঞেস করাতে পোর্তে বলল, এটা গামহার গাছ। ঝাঁজি বলল, বিহারে অনেক গামহার গাছ দেখেছি।

নিজের নতুন বউ-এর কাছে নিজের জ্ঞান জাহির করতে সকলেরই ভাল লাগে। ঝাঁজিরও ভাল লাগছিল।

—বিহার, না ঝাড়খণ্ড?

ঝিনুক বলল।

—আরে তখন তো আর ঝাড়খণ্ড-এর জন্ম হয়নি।

—তা বটে।

তারপর বলল, গাড়িতেই বসে থাকবি, না নামবি?

—চল্ নামি। বাঃ বারান্দাটা কী দারুণ! তাই না?

বনবাংলোর মজা তো বারান্দাতেই। অন্য বাংলোতে বারান্দা সাধারণত সামনের দিকেই থাকে, এই বাংলোতে চারদিকেই বারান্দা।

দু'পাশে দুটি বেডরুম। মধ্যে ডাইনিং-কাম ড্রয়িংরুম। বহুদিন বাংলোর সংস্কার হয় না। মলিন, প্রাচীন সব ফার্নিচার। বসার ঘরে সোফা-টোফাও নেই, দেখেছিস। তবে ক্রকারি-কাটলারি থাকবে নিশ্চয়ই!

ঝিনুক বলল।

গলা নামিয়ে ঝাঁজি বলল, আমরা সোফা দিয়ে কী করব। বিছানাতেই তো থাকব। তোকে চেটেপুটে খাব। আর মাঝে মাঝে বারান্দায় এসে বসব।

তারপর বলল, ওই দ্যাখ সামনে বাগানে একটা ঢাল মতো, আর টালি দেওয়া ছাদের নীচে একটা গোল বসার ঘর। চেয়ারও আছে দেখা যাচ্ছে। জমে যাবে। কী বলিস।

ততক্ষণে চৌকিদার এসে দাঁড়িয়েছে। নাম বলল, গণা গোন্দ। লোকটার মুখ দেখে মনে হল না বিশেষ কাজের বলে। তা ছাড়া, কাজ করার ইচ্ছেও তার আছে বলে মনে হল না।

পোর্তে মালপত্র বাঁ-দিকের ঘরে রেখে বলল, সাহেব আমি আমার গ্রাম থেকে ঘুরে আসছি। দেখি মুরগি পেলে নিয়ে আসব। আপনারা চা-টা খান। আমি এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসব। তারপর আপনাদের খাওয়া দাওয়া হয়ে গেলে আমি বাড়ি গিয়ে ঘুমোব। অনেকদিন বাড়িতে যাই না। ছেলেটা বড় ন্যাওটা হয়েছে।

—কত বড় হয়েছে?

চার বছরের।

ঝিনুক নিজের ব্যাগ খুলে দুটি চকোলেটের স্ল্যাব দিয়ে বলল, ছেলেকে দিও পোর্তে। বিলিতি চকোলেট। বিয়েতে আমার এক বন্ধু দিয়েছিল।

খুব খুশি হল পোর্তে। গণা গোন্দকে চায়ের প্যাকেট, বিস্কিটের প্যাকেট, কনডেনসড মিল্ক সব বের করে দিল ওদের চায়ের জন্যে।

—পুরো ঝুড়িটাই দিয়ে দাও না।

ঝিনুক বলল।

পোর্তে বলল, তার দরকার নেই। বলেই, চোখ দিয়ে ইশারা করল।

ওরা বুঝল যে গণা গোন্দ-এর উপর তার বিশেষ ভরসা নেই।

ঝাঁজি বলল, যাও তুমি ঘুরে এসো। আমরাও সামনের বসার জায়গাটাতে গিয়ে বসছি হাত-মুখ ধুয়ে, চা-টা চৌকিদার তুমি ওখানেই নিয়ে এসো। টি-কোজি আছে তো?

গণা গোন্দ টি-কোজি শব্দটা বুঝতে না পেরে বোকার মতো চেয়ে থাকল।

ঝাঁজি বলল, চায়ের কেটলি ঢেকে রাখার গরম কাপড়ের ঢাকনা। যা দিয়ে ঢেকে রাখলে চা গরম থাকে।

বুঝতে পেরে গণা বলল, হ্যায় হ্যায়। কেটলিমে ঢাক্কন দে করই লেতে যায়গা।

ঝিনুক বলল, চা তোমায় ভেজাতে হবে না। আমরাই ভিজিয়ে নেব। ট্রেতে করে চায়ের আর বিস্কিটের প্যাকেট আর কাপ ডিশ ছাঁকনি চামচ এ সব নিয়ে এসো পনেরো মিনিট পরে।

—ঠিক হ্যায় মেম সাব।

চৌকিদার গণা গোন্দ ভিতরে চলে গেলে ওরা দু'জনে গিয়ে সামনের সেই বসার জায়গাটাতে বসল। জায়গাটা বাংলো থেকে প্রায় পাঁচশ গজ মতো দূরে একটা ঢাল-এর উপরে। ঢালটা গিয়ে একেবারে পিচরাস্তা অবধি পৌঁছেছে। এ বাংলোর হাতাটা মস্ত বড়। দু'পাশে অগণ্য কাগজী লেবুর গাছ লাগানো হয়েছে। মধ্যপ্রদেশে লেবু হয়তো দুষ্প্রাপ্য তবে বন বাংলোর হাতাতে নানারকম বন্য ফুলের বড় ছোট গাছ থাকলেই মানায় ভাল। ইংরেজদের আর যাই দোষ থাক সৌন্দর্যজ্ঞান ছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের বন-বিভাগ খোদার উপর খোদকারী করে প্রায় প্রতি বাংলোতেই যে সব কারিকুরি করেছেন তা আদৌ নান্দনিক নয়। বড়মামার সঙ্গে অনেক রাজ্যের বন বাংলোতে যাবার সুযোগ ঝাঁজির হয়েছিল বলেই এ কথা ও জানে। তবে এ বাবদে পশ্চিমবঙ্গের বনবিভাগের আমলাদের রুচির প্রশংসা করতেই হয়।

বৃষ্টি থেমে গিয়েছে একটু আগে। বৃষ্টি-ভেজা গাছগাছালি ফুল পাতা ঘাস থেকে মিষ্টি গন্ধ বেরোচ্ছে। আগামী সপ্তাহের শেষে দোল-পূর্ণিমা কিন্তু ওদের তখন জঙ্গলে থাকা হবে না। বিয়ের পরে প্রথম বাসন্তী পূর্ণিমাতে শান্তিনিকেতনে যেতে হবে ওদের। ঝুমকি এখন বিশ্বভারতীর সঙ্গীত ভবনে আছে। ওদের বিয়ের আগে থাকতেই বলে রেখেছে ঝুমকি আর রজত। রজত কলা ভবনের ফ্যাকাল্টিতে, ঝুমকি সঙ্গীত ভবনের ফ্যাকাল্টিতে।

দু'জনেই একই সঙ্গে একই ভাবনা ভাবছিল—একেই বলে টেলিপ্যাথি। ঝিনুক বলল, জঙ্গলে থেকে গেলেই হত তাই না?

—তা তো হতই। কিন্তু কথার খেলাপ হবে। তা ছাড়া শান্তিনিকেতনের বসন্তোৎসব একটা অন্য ব্যাপার। আজকাল যদিও বিচ্ছিরি ভিড় হয়।

—কোয়ালিটিটিভ ভিড়-এর কথা বলছিস?

—কোয়ালিটিটিভ ভিড় তো থাকেই তবে, কোয়ানটিটিভ ভিড়ের কথাই বলছি। মায়ের মুখে শুনেছি আগেকার দিনে এমন একটা সুন্দর ঘরোয়া পরিবেশ ছিল। গাছগাছালিও কত ছিল। ইলামবাজারের দিক থেকে গাড়ি চালিয়ে শান্তিনিকেতনে এলে দোলের আগে পলাশফুলের গালচে মাড়িয়ে আসত গাড়ি। জঙ্গলটাও কী গভীর ছিল। জর্জমামা, মোহরমাসি, বাচ্চুমাসি খালি গলাতে গান গাইতেন। বুলা জেঠু বাঁশি বাজাতেন।

—বুলা জেঠু মানে?

—বুলা মহলানবিশ। তখনকার দিনের সেলিব্রিটিরা সত্যিই সম্মান করার মতো মানুষ ছিলেন। আর এখন তো রজত আর ঝুমকিও সেলিব্রিটি—তাদের নিজের নিজের জগতে।

তবু ওরা তো সিউডো-সেলিব্রিটি নয়। আজকাল ছদ্ম আঁতেল-এ দেশ ভরে গেছে।

—যা বলেছিস। আর একটা জিনিস হয়েছে, একটা দুরারোগ্য রোগ—যা আগে কখনওই ছিল না।

—কী সেটা?

—যশাকাঙ্ক্ষা। একলাইনও লিখতে পারে না সেও লেখক, যার গলাতে সুরই নেই সেও গায়ক, যার উচ্চারণ জড়তাপূর্ণ, অপরিষ্কার, সেই আবৃত্তিকার! সকলেরই স্টেজে ওঠার, টিভি ক্যামেরাতে মুখ দেখানোর অদম্য ইচ্ছা। সকলেরই একটি ক্যাসেট করা দরকার। এই ডামাডোলে প্রকৃত গুণী যাঁরা, তাঁরা মুখ লুকিয়ে নিজের নিজের ঘরে বসে আছেন। তাঁদের কেউ চেনেও না, চেনবার ইচ্ছেও নেই।

—যা বলেছিস। পুরো আবহটাই লজ্জাকর হয়ে গেছে।

সেদিন বুবলিদা বলছিল একটা নতুন উপন্যাসে হাত দিয়েছে। তার নাম দিয়েছে 'নবরিপু'। সত্যিই! যশাকাঙ্ক্ষা ব্যাপারটা এখন এমন একটা ম্যাগনিচুডে পৌঁছেছে যে তাকে একটি রিপুই বলা চলে। কী না করছে পুরুষ ও নারী যশপ্রার্থনার জন্যে, অকাতরে অর্থব্যয় করছে, অমানুষের পায়ে তেল মাখাচ্ছে, মেয়েরা তাদের শরীর বিলোচ্ছে অকাতরে শবযাত্রার খই-এর মতো নির্বিকারে— শুধু একটু যশের জন্যে।

—ক্যাসেট করে সেই ক্যাসেটের বিজ্ঞাপন দিচ্ছে বিশেষ বিশেষ টিভি চ্যানেলে—উদ্ভট সেজে, গাছ জড়িয়ে, ফুলবনে হেঁটে, বিদেশি মিউজিক চ্যানেলের অনুকরণে। সবকিছুরই পণ্যায়ন সম্পূর্ণ হয়েছে। দেখলে গা রি-রি করে।

—যাকগে। হানিমুনে এসে এইসব আজেবাজে জিনিস নিয়ে আলোচনা করব না আমরা। আমরা আমাদের কথা বলব। এখানকার পরিবেশের কথা বলব। যাতে বাকি জীবন এই দিনকটির কথা মনে থাকে।

ঝাঁজি বলল। তারপর বলল, বুবলিদা বলছিলেন, হানিমুনে যাচ্ছিস, বিট ইট আপ। পরে তো বিবাহিত জীবনটা একঘেয়ে একটা অভ্যেস হয়ে যাবে।

—তুমি তো নিজে বিয়ে করলেই না। তুমি জানলে কী করে? আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম।

—করিনি তো সেই জন্যেই! বিয়ের পরে পরে তো সুখের অন্ধ আঁধির মধ্যে পড়া দুটি পরম সুখী পাখির মতো দিনগুলো উড়তে থাকে। শরীরী সুখে তখন দুজনেই আকণ্ঠ ডুবে থাকে, একে অন্যকে কতভাবে আবিষ্কার করে, কত পরীক্ষা-নিরীক্ষা। হাতে নতুন খেলনা পাওয়া শিশুর মতো অবোধ আনন্দে মেতে থাকে। তার পরে একদিন ঘোর কাটতে থাকে, রঙ চটতে থাকে, ভিতরের মরচে ধরা কাঠামোটা বেরিয়ে পড়তে থাকে। তারও পরে সন্তান এসে গেলে তো অপত্যর কাছে দাম্পত্য ক্রমশই হেরে যেতে থাকে। দম্পতির জীবনের সবকিছুই সন্তানের হিতাহিতের সঙ্গে, তার ভবিষ্যৎ-এর ভাবনা নিয়ে আবর্তিত হতে থাকে। নিজেদের নিজস্ব জীবন বলতে আর যেন কিছুমাত্রই থাকে না। তারও পরে, অনেক দিন পরে, বিশেষ করে আজকালকার দিনে সেই সন্তান, যার জন্যে একটি দম্পতি তাদের জীবনের সবচেয়ে সুন্দর সময়ের সবটুকু নিজেদের নানাভাবে বঞ্চিত করে সন্তানকে বড় করবার, ভাল করবার জন্যে ব্যয় করে এল, মা-বাবাকে জোড়া পায়ে লাথি মেরে নিজের সুখ, স্বাধীনতা, স্বেচ্ছাচারের খোঁজে ঘরছাড়া হবে সেদিন বড় দেরি হয়ে যাবে। জীবন থেকে দু'জনের মধ্যে একজনের ছুটি হয়ে গেলে অন্যজনের আশ্রয় হবে ওল্ড এজ হোম-এ। আধুনিক জীবনের এই তো পরিণতি।

ঝিনুক বিরক্ত হয়ে বলল, চুপ কর তো। তোর বুবলিদার কথা শুনতে আমার ভাল লাগে না। বিশেষ করে আমাদের জীবনের সবচেয়ে সুন্দর সময়টাতে, ঠাকমার ভাষায় বলতে গেলে এইসব অকথা-কুকথা ভাল লাগছে না। তা ছাড়া সকলের জীবনের পরিণতি যে এমনই হবে তারই-বা কী মানে আছে। ব্যতিক্রম তো থাকেই।

তারপর বলল, তোর বুবলিদা যেন সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষ। আর তার লেখাও আমার ভাল লাগে না। প্রবন্ধের ভাষাতে উপন্যাস লেখে। যে লেখকের এই জ্ঞানটুকুই হয়নি যে একেকটা লেখার ভাষা একেকরকম হওয়া উচিত, ভাষামাত্রই ভাবের বাহন, ভাষার সঙ্গে যদি ভাবের সাযুজ্যই না থাকল তবে সে ভাষা বিফল হতে বাধ্য।

—বিফল হওয়া মানে?

—বিফল হওয়া মানে, পাঠক-পাঠিকার হৃদয় স্পর্শ করার অক্ষমতা।

—সব লেখক তো হৃদয় স্পর্শ করার জন্যে লেখেন না। মস্তিষ্ক স্পর্শ করাই হয়তো তাঁদের উদ্দেশ্য। এই অস্থির অবিবেচক সময়ই তাঁদের উপজীব্য। স্রোতের বিরুদ্ধে গিয়ে কিছু লেখা, রুচি ও মানসিকতার উন্নতি করাও যে একজন সৎ লেখকের কর্তব্য এ কথা তোর বুবলিদার মতো লেখকেরা স্বচ্ছন্দে ভুলে থাকেন।

—তা হতে পারে, কিন্তু উদ্দেশ্যর সঙ্গে বিধেয়রও একটা সম্পর্ক তো থাকবে।

—তোর বুবলিদা তো লেখেন লিটল ম্যাগাজিন-এ। কোনও বড় কাগজ কি তাঁর লেখা ছাপে?

—বড় কাগজ মানে কি তুই বাজারী কাগজের কথা বলছিস।

—হ্যাঁ। যে সব কাগজ অনেকে পড়ে।

—অনেকে তো পঞ্জিকাও পড়ে। পঞ্জিকা বা রেলের টাইম-টেবলও কি তা হলে মহৎ সাহিত্য হিসেবে বিবেচিত হবে? একটা কথা মনে রাখিস। তা হল বাংলা সাহিত্যের মহত্তম সব সৃষ্টি অখ্যাত এবং লিটল ম্যাগ-এই প্রকাশিত হয়েছে আজ পর্যন্ত। বাজারী কাগজ তো মালিকের বাড়ির চাকর-বাকরকে অথবা তাদের অণ্ডকোষ বহনকারীদের লেখাও ইচ্ছে করলেই ছেপে দিতে পারে, কিন্তু তা ছাপলেই কি তা মহৎ সাহিত্য বলে গণ্য হয়? বাজারী কাগজ ক'জন মহৎ সাহিত্যিক সৃষ্টি করেছে আজ অবধি? নাম কর না! রবীন্দ্রনাথ থেকে জীবনানন্দ, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে সতীনাথ ভাদুড়ি, আশাপূর্ণা দেবী থেকে মহাশ্বেতা দেবী। ওঁরা যাঁদের বৃষ্টির মতো সৃষ্টি করেছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই গত হবার পরে এমনকী নিজেদের জীবদ্দশাতেই তাঁদের সাধারণত্ব প্রমাণ করেছেন। জীবন শেষ হবার আগেই মুছে গেছেন মানুষের মন থেকে। সেই সব লেখককে লেখক বলেই আমি মনে করি না।

ঝিনুক বলল, দ্যাখ ঝাঁজি, তোর লাইকিং ডিসলাইকিং যে এত স্ট্রং সে সম্বন্ধে আমার কোনও ধারণা ছিল না। তোর সহনশীলতাও বড় কম। তোর সঙ্গে বাইরে না এলে তোকে এমন করে জানা হতো না।

—শুধু কি বাইরেই আসা! এই আসা তো শরীর মনের ভিতরেও আসা। এ তো নিছক আসা নয়, এ তো আশাও। দু'জনের পুরো জীবনের অনেক আশাই অঙ্কুরিত হবে এই বাইরে আসায়। তুই চাইলে তোর শরীরেও আমার বীজ বপন করতে পারি আমি।

ঝিনুক হেসে বলল, করাচ্ছি। ওরকম ভুল আমি করব না, তোকেও করতে দেব না।

তারপরই বলল, ওই দ্যাখ চা নিয়ে আসছে গণা। ভাল করে চা-টা করে খাওয়া তো আমাকে। কনসিডারেট হাজব্যান্ডহুডের প্রথম পরীক্ষাটা দে তো দেখি।

—আমার হাসি পাচ্ছে।

ঝাঁজি বলল।

—কেন?

জ্যোতি বসুর ডাক নাম গণা। জানিস কি তুই? জাস্ট ইমাজিন কর, জ্যোতি বসু কাঁধের উপরে একখানা আধময়লা ঝাড়ন ফেলে, ভক্তিভরে চা-এর ট্রে নিয়ে আসছেন, আমাদের জন্যে অরণ্যের মধ্যে এই লামনি বাংলোর হাতাতে।

—দিনকে দিন তাঁর অবস্থা যা হয়ে উঠছে মান-সম্মান নিয়ে মানে মানে ওঁর এখন কেটে পড়াই ভাল।

—নে এবার চা-টা কর। আমার চায়ে এক চামচ চিনি এবং অল্প দুধ দিস। আর আমি পাতলা চা খাই।

—তোকে চা ভিজলেই প্রথম কাপ ঢেলে দেব। আমি কড়া চা খেতে ভালবাসি। বেশি দুধ এবং দু'চামচ চিনি দিয়ে।

—ঠিক আছে। তুই চা-টা ভেজা। আমি বিস্কিটের প্যাকেটটা খুলি।

—কী বিস্কিট দিয়েছেন সুভাষমামা?

—বিস্ক ফার্ম-এর বিস্কিট। চকো ক্রিম আর টপ।

—এটা আবার কী বিস্কিট?

—খাসনি? এই বিস্কিট ব্রিটানিয়ার চেয়েও ভাল। বাঙালি কোম্পানির বিস্কিট। খেয়ে দ্যাখ। মা বলেন, ওঁদের ছেলেবেলার হান্টলি-পামার ইংলিশ বিস্কিটের কথা মনে পড়ে যায় এই বিস্কুট খেলে।

—সেটা কী বিস্কিট?

—ইংলিশ বিস্কিট। তখন বিলেত থেকে আসত। দেশি বিস্কিট বলতে তো তখন ছিল লেড়ো বিস্কিট, আর ব্রিটানিয়ার থিন অ্যারারুট আর মারি।

—কেন, লিলি বিস্কিটও ছিল।

—ছেলেবেলায় লঙ্কা দেওয়া ঝাল বিস্কিটও ছিল। দারুণ বিস্কিট। কোনও অখ্যাত দিশি কোম্পানি বানাত কিন্তু স্বাদ দারুণ।

গণা গোন্দ বলল, চা খাওয়া হয়ে গেলে আপনারা যদি টিভি দেখতে চান তা হলে আপনাদের পঞ্চায়েতের ঘরে নিয়ে যাব।

ঝাঁজি বলল, না আমরা টিভি দেখতে আসিনি এই জঙ্গলে। এমনকী খবরের কাগজ পড়তেও না।

তারপর বলল, এখানে টিভি এল কবে?

—ওই, রাজীব গান্ধীর আসার কথা ছিল এ দিকে। সে জন্যে পঞ্চায়েতের পাকা ঘর বানানো হয়েছিল। সেখানেই পঞ্চায়েত থেকে টিভি বসানো হয়েছে গত বছর। রাজীব গান্ধী শেষ পর্যন্ত আসেননি কিন্তু ঘরটা তো রয়েই গেছে। যাবেন না?

—না। ওরা দু'জনেই একসঙ্গে বলল।

চা খেতে খেতে ঝিনুক বলল, টিভির যে-কোনও চ্যানেল খুললে একটাই কথা মনে আসে।

—কী?

—আমাদের দেশের সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নানা অপরাধ, খাদ্য, নারী নিগ্রহ। এমনকী সব সমস্যার মূলে যে সমস্যা সেই জনসংখ্যার সমস্যাও।

—মানে?

—মানে দেশে এখন একটিই সমস্যা, কোন শ্যাম্পু ব্যবহার করা উচিত।

ঝাঁজি হেসে উঠে বলল, এটা ভালই বলেছিস।

চা খেতে খেতে ওরা পথের দিকে চেয়ে ছিল আর মীট্টি নালার দিকে। বৃষ্টি থেমে গেলেও আকাশ মেঘে ঢাকা। গায়ে শিরশিরানি তোলা একটা হাওয়া বইছে। বৃষ্টিভেজা গাছপালার পাতাতে তারই মর্মরধ্বনি। কেঁওচি আর অচানকমারের দিক থেকে ট্রাক আসছে যাচ্ছে। বৃষ্টিভেজা পিচের পথে টায়ারের পিচ-পিচ শব্দ। একটু পরেই সন্ধে নেমে যাবে। মীট্টি নালার জলরেখার উপরে উপরে একজোড়া টিটি পাখি ডাকছে। উড়ছে। তাতে অপরিচিত আরণ্যক পরিবেশের আসন্ন সন্ধ্যার রহস্যময়তা যেন আরও বেড়ে গেল। গা ছমছম করছিল ঝিনুকের।

—এই পাখিগুলোর ডাক যেন বুকের মধ্যে ছমছমানি আরও বাড়িয়ে দেয়। কী পাখিরে এগুলো? লম্বা লম্বা পা ঝুলিয়ে এবং দুলিয়ে বুকের মধ্যে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিচ্ছে এমন করে!

ঝাঁজি বলল, প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয় বলেই তো এদের নাম ডিড-উ-ড্যু-ইট। অন্য একটা নামও আছে। অর্নিথোলজিস্টরা জানেন।

—তুই তো জেনে নিলে পারিস। তোর তো অনেক এনজিওর সঙ্গে জানাশোনা আছে।

—তা আছে। তবে এখন আবার নানারকম এনজিওদের আবির্ভাব ঘটেছে। উ্য হ্যাভ টু টেক ইট উইথ আ পিঞ্চ অফ সল্ট। ওয়াইল্ড লাইফ ফোটোগ্রাফি আর ওয়াইল্ড-লাইফ রাইটিং আজকাল একটি পেশা হয়ে গেছে অনেকেরই কাছে। প্রকৃত ভালবাসার তুলনায় অর্থাগম এবং যশাকাঙ্ক্ষাই প্রবল হয়ে উঠেছে। তাই অনেক এনজিও এবং এনজিআইকে চিনলেও সকলের সম্বন্ধেই যে ভাল ধারণা আছে এমন বলতে পারি না।

দেখতে দেখতে পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে গেল চারপাশ। এখন এই বসার জায়গা থেকে বাংলোতে ফিরতে হলে অন্ধকারের মধ্যে ফিরতে হবে। অথচ বাইরে এসে বসার আগে টর্চ বের করে আনেনি স্যুটকেস থেকে। টর্চ দুটো হাতব্যাগেই রাখা উচিত ছিল দু'জনের।

এমন সময়ে দেখা গেল কাঁকুরে মাটিতে নাল লাগানো জুতোর শব্দ তুলে, মানুষটিকে দেখা যাচ্ছে না, তার টর্চের আলোয় তার পায়ের সামনে একটি বৃত্ত রচনা করে তারই নৃত্যরত বৃত্তের পিছনে সে হেঁটে আসছে। কাছে এসে মানুষটা যখন কথা বলল তখন তার গলার স্বরে চেনা গেল তাকে। ঘাসীরাম পোর্তে।

—চায়ে পী লিয়া না সাহাব?

—হাঁ পী লায়া। চৌকিদার গণা গোন্দ চায়েকে বর্তন নেহি লে গ্যায়া অভিতক?

—উও তো শকলই নেহি দেখায়া চায়ে দেনেকা বাদ।

ঝাঁজি বলল।

গণা এরকমই। ওর ব্যবহার এরকম যে কোনও মানুষ এই বাংলোতে আসে তা যেন ও চায় না। এক নম্বরের কুঁড়ে। কোনওরকমে অতিথিদের খাইয়ে দাইয়ে গ্রামে গিয়ে নিজের ঘরে শুতে পারলেই হল।

—রাতে এই বাংলোতে থাকে না ও?

—না সাহাব।

—এই নির্জনে নদীপারের এই বাংলোতে আমরা একা থাকব? গেটেও তালা-টালা কিছুই নেই।

—তালা থাকলেই বা কী? আসতে চাইলে তো সামনে পেছনে বা ডান বা বাঁ-পাশ দিয়ে যে কেউই আসতে পারে। তবে এখন পর্যন্ত কোনও ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু এই টিভি দেখে মানুষদের, বিশেষ করে অল্পবয়সিদের লালচ বড় বেড়ে গেছে। এখনকার সময়ের কথা জোর করে বলা যায় না। তবে আপনাদের চিন্তা নেই। আমি থাকব বাংলোতে। গাড়িতেই শুয়ে থাকব। বাবুর্চিখানার সামনেই তো গাড়ি লাগানো আছে।

তারপর বলল চলুন, সাব-মেমসাব। আমি ট্রেটা নিয়ে নিচ্ছি। আপনাদের মধ্যে কেউ টর্চটা ধরুন।

—টর্চটা এনেছ কেন পোর্তে? সাপ-খোপ আছে না কি?

—সাপ-খোপ জঙ্গুলে জায়গাতে থাকতে তো পারেই। তা ছাড়া আমরা জঙ্গলের মধ্যেই বড় হয়েছি তো। অন্ধকারের পরে বাইরে বেরোতে হলেই আমরা আলো নিয়েই বেরোই। সে লণ্ঠনই হোক কি কুপীই হোক বা অন্য কিছু। জঙ্গল আর এখন তেমন নেই, জংলী জানোয়ারও কমে গেছে আগের থেকে অনেক। তবে পুরনো অভ্যেসটা এখনও রয়ে গেছে।

তারপর পোর্তে হেসে বলল, খতরনাক জানোয়ার এখন শহরেই বেশি এই সব জঙ্গলের চেয়ে।

ঝাঁজি বলল, তা ঠিক।

ঝিনুক বলল, মুরগি পেলে?

—হ্যাঁ পেয়েছি। গণা গোন্দ কুঁড়ে হলে কী হয় ওর রান্নার হাতটা খুবই ভাল। সাহেবি রান্নাও সব জানে। রাতে চিকেন রোস্ট করতে বলব পোলাও-এর সঙ্গে। না কি খিচুড়িই খাবেন আপনারা? আকাশের যে অবস্থা আর পনেরো কুড়ি মিনিটের মধ্যেই বৃষ্টি নামবে আবার। খিচুড়ি আর চিকেন রোস্ট-এর সঙ্গে আর কী বানাতে বলব?

—কড়কড়ে করে আলুভাজা, শুকনো লঙ্কা ভাজা।

তারপর বলল, সুইট-ডিশ কী খাবেন?

ঝিনুক বলল, কী করতে পারে তোমার গণা গোন্দ?

ও খুব ভাল পুডিং বানাতে পারে। হাওয়াই-পুডিং। ক্যারামেল কাস্টার্ডও করতে পারে তবে তার জন্যে মাল মশলা তো চাই, বিলাসপুর কি শেওতারাই থেকে নিয়ে এলে হত। এত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়তে হল যে সব কিছু আনার সময় হল না।

—ওতেই যথেষ্ট হবে। এমনি পুডিংই করুক।

বাংলোতে পৌঁছে বারান্দাতে চেয়ার পেতে বসল ঝাঁজি। ঝিনুক বাংলোর সামনে পায়চারী করতে লাগল। আকাশ ঘন কালো। একটিও তারা নেই। শুক্লপক্ষ বটে, চাঁদের কোনও পাত্তাই নেই। দিনের বেলা বর্ষা ভাল লাগে কিন্তু রাতের বেলা, এক শোবার সময় ছাড়া, বৃষ্টি পড়লে ভাল লাগে না।

পোর্তে চলে গেলে ঝাঁজি বারান্দাতে বসেই গলা নামিয়ে বলল, খাওয়া-দাওয়া নিয়ে এত আলোচনার কী দরকার। আজ তো তোকেই আমি খাব। মেইনল্যান্ড চায়নাতে জেলি-ফিশ যেমন করে সার্ভ করে আজ তুই তেমন করে খাটে শুয়ে থাকবি আর আমি তোকে চেটেপুটে খাব।

ঝিনুক কিছু বলার আগেই ঝাঁজি আবার বলল, উপমাটা বোধহয় ঠিক হল না। সেই খাওয়া তো একতরফের খাওয়া। আমি তো একাই তোকে খাব না, তুইও তো আমাকে খাবি। রেসিপ্রকেশন না থাকলে বড় আদরে কোনও মজাই থাকে না।

—এমন করে বলছিস যে মনে হচ্ছে কামশাস্ত্র তুই গুলে খেয়েছিস।

—যার প্র্যাকটিক্যাল অভিজ্ঞতা নেই তার শাস্ত্র গুলে খাওয়া ছাড়া উপায় কী? তোর জীবনেও আমি যেমন প্রথম পুরুষ তুইও আমার জীবনে প্রথম নারী। দুই আনাড়ি মিলে জানতে হবে কী পারি আর না পারি।

—অসভ্যতা করিস না তো। সব ব্যাপারেই কথা বললে সেই ব্যাপারের মাধুর্য নষ্ট হয়ে যায়।

—বেশ। কথার দিন শেষ। এখন কাজের রাত।

বলেই বলল, আমার কিন্তু ভয় করছে।

—আমার তো ভীষণই করছে। ট্রেনের কুপেতে যা কিছু ঘটেছিল সেটা তো মুখবন্ধ। আজ রাতেই পুরো বই পড়া হবে দু'জনেরই।

—একটা জিনিস আমাদের অজান্তে ঘটে যাওয়াতে আজ রাতটা দারুণই রোম্যান্টিক হয়ে উঠবে। এই বন-বাংলোতে যে বিজলি নেই এ কথা সুভাষমামা কিন্তু আমাদের জানাননি। হয়তো প্লেজেন্ট-সারপ্রাইজ হবে, সে জন্যেই। গরম তো একেবারেই নেই, দিনের বেলাতেও শীত-শীতই করছিল আর রাতে তো কম্বল গায়ে দিতে হবে বলে মনে হচ্ছে।

ঝিনুক বলল।

—তুইও যেমন! আনকোরা নতুন বউ সঙ্গে থাকলে কম্বলের কী দরকার? আমার তো বুকময় চুল। তোর শীত করলে আমার বুক-কম্বলে শুয়ে থাকবি।

এমন সময়ে পোর্তে এসে বারান্দাতে একটা লণ্ঠন রেখে গেল। তাতে রাতের রহস্যময়তা আরও বেড়ে গেল। মীট্টি নালার উপরে উপরে পাখি দুটো তখনও ডিড-ড্যা-ড্যু-ইট ডিড-ড্যা-ড্যু-ইট করে ডেকে যাচ্ছিল।

ঝাঁজি বলল, উই উইল সার্টেনলি ডু-ইট টু-নাইট।

ঝিনুক বলল, প্লিজ স্টপ ইট।

পোর্তে তখনও যায়নি বারান্দা ছেড়ে। ঝাঁজি বলল, এখানে কী কী দেখার জায়গা আছে? আছে কি কিছু জঙ্গল ছাড়া?

—তেমন কিছু নেই জঙ্গল ছাড়া। কাল দুপুরে আপনারা কেঁওচির ধাবাতে গিয়ে দুপুরের খাওয়া খেতে পারেন। নানারকম খাওয়ার পাওয়া যায়। আর সকালে আপনাদের নিয়ে যেতে পারি মেন্ড্রিসেরাই দেখাতে।

—মেন্ড্রিসেরাই? সেটা কী জিনিস?

—সেরাই মানে হচ্ছে শাল গাছ। মধ্যপ্রদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম গাছ হচ্ছে এই মেন্ড্রিসেরাই। এই গাছ দেবতাও। এই অঞ্চলের আদিবাসী মানুষদের রক্ষয়িত্রী দেবী। যখন কাল যাব তখন মেন্ড্রিসেরাই সম্বন্ধে আরও অনেক কথা জানাব আপনাদের।

—বেশ। তুমিও আমাদের সঙ্গে খেয়ে নিও পোর্তে।

—এটা বাদ দিন সাহেব। এদিকে তো দু'তিন মাস অন্তর আসি। এলে বউ-ছেলের সঙ্গে একটু সময় কাটাই। আমার বউ আজ আমার জন্যে বাজরার রুটি, মুগের ডাল, দেশি ঘি ঢেলে বানাবে আর সঙ্গে আলুর চোকা আর আঁওলার আচার।

—আরে বাঃ। আগে জানলে তো তোমার বাড়িতে আমরাও খেতে পারতাম।

—আমি গরিব লোক সাহেব। আমার ওই বস্তীর ঘরে কি আপনাদের মতো মানুষদের নিয়ে যাওয়া যায়? যদি খেতে চান তা হলে বউকে বলব একদিন রেঁধে এখানে এনে খাইয়ে যাবে।

—তোমার বউ-এর নাম কী?

—হনসো।

—সম্বন্ধ করে বিয়ে হয়েছে না নিজেই পছন্দ করে বিয়ে করেছ?

—নিজের পছন্দে। আমার বিয়ে হয়েছে আঠেরো বছর বয়সে। তখন হনসোর বয়স ষোলো। আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন আমাদের গ্রামেও ঘোটুল ছিল এখন সে সব আস্তে আস্তে উঠে যাচ্ছে।

—ঘোটুলটা কী ব্যাপার?

ঝাঁজি বলল।

—তুই ভেরিয়ার এলউইনের লেখা পড়িসনি কি? আমাদের দেশের অনেক আদিবাসীদের মধ্যেই ঘোটুল ছিল। মেয়েরা ঋতুমতী হবার কিছুদিন পরেই সারা দিন যে যার কাজ করার পরে গ্রামের অবিবাহিত অল্পবয়সী যুবকদের সঙ্গে ঘোটুলে চলে আসে সন্ধের পরে। ঘোটুল একটা মস্ত ঘর। গ্রামের সীমানার বাইরে করা হয় ঘোটুল। সামনে একটু ফাঁকা জমি থাকে, বড় উঠোনের মতো। তার মধ্যে একটা থাম থাকে। থামের উপরে লণ্ঠন কিংবা হ্যাজাক জ্বালিয়ে ছেলেমেয়েরা নাচগান করে, তার পর নিজের নিজের পছন্দমতো সঙ্গী বা সঙ্গিনীর সঙ্গে রাত কাটায়। ওই সম্পর্ক দু'রকম হয়। এক জোড়িদার, আর অন্যটা অদলবদল।

—মানে?

ঝাঁজি জিজ্ঞেস করল।

—জোড়িদার মানে, প্রথম থেকে এক যুগল একই সঙ্গে বা সঙ্গিনীর সঙ্গে থাকে। আর অদলবদল মানে পার্টনার বদলায় ওরা। অদলবদল করে ওদের মনোমতো জীবনসাথী নির্বাচন করে। আজকে বড় বড় শহরের স্কুল-কলেজে সেক্স-এডুকেশন নিয়ে কথা উঠছে কিন্তু এদের মধ্যে সেক্স-এডুকেশন চালু আছে প্রাচীন কাল থেকে।

—তাই!

—তাই তো। জিজ্ঞেস কর না পোর্তেকে।

ঝিনুক বলল।

তারপর বলল, পোর্তেকে, তুমি আর তোমার বউ কি অদলবদল করেছিলে? না, জোড়িদার?

পোর্তে হেসে বলল, জোড়িদার।

ঝাঁজি বলল, কাল সকালে না আমাদের অচানকমারে যাবার কথা।

পোর্তে বলল, অচানকমারে যেতে হলেও পেছন দিকে যেতে হবে। এখানে দিন দুই থেকে অমরকণ্টকে এক রাত থেকে যখন বিলাসপুরের দিকে ফিরব তখন দু'দিন অচানকমারে কাটিয়ে যাবেন। সেটাই ভাল হবে।

—কিন্তু অচানকমারের চৌকিদারকে যে বলে এলাম কাল যাব বলে।

—আমি এখানকার ফরেস্ট অফিসে গিয়ে রেঞ্জার সাহেবকে বলব সকালেই অচানকমারের ফরেস্ট অফিসে ফোন করে বলে দেবেন। কনসার্ভেটর সাহেব তো শেওতারাই-এর অফিসে বলেই রেখেছেন। তিনি

অচানকমারেই বলে দিতে পারতেন কিন্তু ফোন খারাপ ছিল তাই শেরতরাইতে বলেছিলেন।

তারপর পোর্তে বলল, মেন্ড্রিসেরাই দেখার পরেও, আপনাকে বুড়াবাবার কাছে নিয়ে যাব।

—তিনি আবার কে?

—সাধু বাবা। জঙ্গলের মধ্যে ছোট আশ্রম বানিয়ে আছেন আজ প্রায় দশ বছর। আগে অমরকণ্টকে ছিলেন। এখন তো মাঝে মাঝে চলে যান অমরকণ্টকের কোনও আখড়াতে। অমরকণ্টক তো সাধু-সন্ন্যাসীদেরই জায়গা। শোন আর নর্মদা নদীর উৎস আছে সেখানে। শোনমুড়া আর নর্মদা-উদগম।

—সাধু-ফাধুতে আমাদের মন নেই। কী করতে যাব সেখানে।

—বুড়া বাবা ফালতু সাধু নন। বহতই পণ্ডিত মানুষ। দেশি মানুষ তো বটেই, অনেক সাহেব-মেমও যান ওঁর কাছে। সাহেবদের মতো ইংরেজি জানেন। আলতু-ফালতু সাধু নন। উনি বাঙালি। লোকের মুখে শুনেছি কলকাতার বহুত পড়েলিখে রহিস আদমী। আপনাদের ভাল লাগতেও পারে। ভাল না লাগলে দেখা করেই চলে আসবেন। যেতে তো কোনও ক্ষতি নেই।

ঝাঁজি বলল, কাল সকালেই ঠিক করব যাব কি না। এখুনি ঠিক করার কী দরকার।

—আপনারা যেমন বলবেন।

তারপর বলল, আপনাদের খাইয়ে আমি বাড়ি গিয়ে খেয়ে ফিরে আসব। রাতে কোনও দরকার হলে আমাকে ডাকবেন। আমি গাড়ির কাঁচ নামিয়ে শোব। সান্নাটা জায়গা তো—ডাকলেই শুনতে পাব স্যার।

—ঠিক আছে।

—আমি তাহলে বাবুর্চিখানাতে গণার কাছে যাই?

—যাও।

পোর্তে চলে গেলে নির্জনতা আবার চেপে বসল। লণ্ঠনের কাচে বর্ষাভেজা বন থেকে নানারকম পোকা উড়ে এসে ধাক্কা খেয়ে ফিরে যাচ্ছিল, নয়তো মাটিতে পড়ে যাচ্ছিল। ঝাঁজি লণ্ঠনটা তুলে নিয়ে দরজার পাল্লার আড়ালে রেখে এল। এবারে আরও ভাল লাগতে লাগল। পিচরাস্তা দিয়ে হেডলাইট জ্বেলে মাঝে মাঝে ট্রাক যাচ্ছিল। তবে ট্রাফিক খুব বেশি নেই।

—চান করবি না তুই? গরম জল দিতে বলব বাথরুমে?

—তুই করবি না?

বড় আদর করার আগে চান তো করতেই হবে। সেই সকালে চান করে বেরিয়েছি।

—খাওয়া দাওয়ার পরে চান করলে কেমন হয়?

—ভালই হয়। একেবারে নাইটি পরে বিছানাতে যাব। এখন চান করলে খাওয়ার টেবলে তো আমায় ধড়াচূড়া পরে আসতে হবে।

—কথাটা মন্দ বলিসনি। এখনই বলে আসি গণা গোন্দকে যে আমাদের ডিনার হয়ে গেলেই দুই বড় বাল্টি গরম জল দিয়ে দেবে বাথরুমে।

বলে, উঠল ও। যেতে যেতে ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, কাল যে তোকে নিজে হাতে চান করাব। তার আগে ইতালিয়ান অলিভ অয়েল দিয়ে তোকে ভাল করে ম্যাসাজ করে দেব। সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।

—তুই বড় সেক্সিস্ট। তুই যে এমন তা তো আগে জানতাম না।

—আমি সেক্সিস্ট নই, রোম্যান্টিক। আর সেক্স তো জীবনের একটা মস্ত বড় দিক। বিশেষ করে নবদম্পতির কাছে। এতে লজ্জা বা অপরাধবোধের কী আছে? তুই রিজিড নোস তো? আমরাও যদি কোনও ঘোটুলে গিয়ে থাকতে পারতাম জোড়িদার বা অদলবদল করে বেশ হত তা হলে, না? সেক্সুয়াল কমপ্যাটিবিলিটি একটা বড় ব্যাপার জীবনে সুখী হওয়ার জন্যে। আমি যদি তোর মনোমতো না হতে পারি কী হবে তা হলে?

—আমি তো শরীর-সর্বস্বী নই। তুই যখন আমার মনোমতো হয়েছিস তাতেই আমি সুখী। দু'জন মানুষের মধ্যে মনের মিলটাই বড় কথা। তুই-ই তো আমার জীবনের একমাত্র পুরুষ। তোর দেওয়া শারীরিক সুখ নিয়েই আমি খুশি থাকব সারা জীবন। আমি তো অন্য কারওকেই শরীর দেব না যে তোর সঙ্গে অন্য কারও তুলনা করতে যাব। একটা সুন্দর ব্যাপার নিয়ে তুই এত লেবু কচলাচ্ছিস যে তেতো হয়ে উঠছে সুন্দর ব্যাপারটা।

—সরি। আমার অন্যায় হয়েছে।

ঝাঁজি অপরাধীর গলাতে বলল।

ঝিনুক সে কথার কোনও জবাব না দিয়ে বাইরের রাত-পাখি ডাকা স্নিগ্ধ, সিক্ত আরণ্যক পরিবেশে মুগ্ধ হয়ে বসে রইল।

ঝাঁজি বারান্দা থেকে মধ্যের ঘরে যেতে না যেতেই তুমুল বৃষ্টি নামল। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। বাজও পড়ল বার কয়েক। বেশ ক্লান্তি

লাগছিল ঝিনুকের। ট্রেনে রাত কেটেছে। তার পর সকাল থেকে শুরু করে গাড়িতে এতখানি পথ আসা। ইচ্ছে করছিল খাওয়া দাওয়ার পর চান করে গভীর ঘুমে শরীর এলিয়ে দেয়। কিন্তু সেই মুহূর্তেই ফার্স্ট ক্লাস এসিতে এলেও ট্রেনের ঘুম আর বাড়ির ঘুমে তফাত থাকেই, যদি না কেউ গার্ড সাহেব হন।

ও হঠাৎই উপলব্ধি করল যে তার কৈশোরকাল থেকে যে শরীরটি শুধুমাত্র তার একারই সম্পত্তি ছিল তার মালিকানা এখন আর তার একার হাতে নেই। সেই মালিকানাতে ভাগ বসাবার মানুষ এসেছে তার জীবনে। এক অপরিচিত, অননুভূত আনন্দ-মিশ্রিত ভয়ে তার বুক দুরদুর করে উঠল।

বাইরে বৃষ্টির দাপট ক্রমশ বাড়তে লাগল। হা হা করতে লাগল হাওয়া, ঝরঝর করে ঝরতে লাগল জল। ওর একা ওই বাংলোর বারান্দাতে বসে থাকতে ভয় করতে লাগল। ভাবল, চলেই যায় ভিতরে। তার পরই ভাবল, এমন পরিবেশে রাতের বেলা আলো-আঁধারিতে বসে এমন ঘন-ঘোর উথাল-পাতাল বৃষ্টি উপভোগ করার সুযোগ তো কলকাতাতে ফিরলে আর হবে না। আর জঙ্গলে হানিমুন করতে আসা তো এই জন্যেই!



কখন ঘুমিয়ে ছিল ওরা নিজেরাই জানে না। প্রত্যেকের জীবনেই এমন এমন রাত আসে যখন ঘড়ি নিছক গয়নাই হয়ে যায়, সময় মাপার যন্ত্র আর থাকে না। প্রবল বৃষ্টিতে ওই পুরনো বাংলোর ছাদ থেকে জল পড়তে লাগল—ঝরঝর করে নয়, টুপ টুপ করে। একবার খাটের এপাশে আসতে লাগল ওরা, আরেকবার ওপাশে।

ঝাঁজি ফিসফিস করে বলল, আয়, তুই আমার বুকে আয়। ঝিনুক তো ঝাঁজির বুকেই থাকে।

তারপর অস্ফুটে বলল, আর ঝিনুকের বুকের মধ্যে থাকে মুক্তো। তোর মুক্তোটা ভারি সুন্দর। তোর শরীরের কেন্দ্রবিন্দুর মসৃণ পেলব রেশমি ঝাঁজির মধ্যে সে লুকিয়ে আছে।

ঝাঁজির বুকের মধ্যে আশ্লেষে শুয়ে ঝিনুক বলল, তুই একটা নম্বরী অসভ্য। আগে যদি জানতাম!

—জানলে কী করতিস? বিয়ে করতিস না? বিয়ে ব্যাপারটা কি আর আমার-তোর হাতে ছিল? এসব প্রি-ডেস্টিনড। ম্যারেজেস আর মেড ইন হেভেন।

ঝিনুক ফিসফিস করে বলল, তুই-তোকারি বন্ধ করো, সুখে শান্তিতে ঘর করো।

হেসে ফেলল, ঝিনুককে আদর করতে করতে ঝাঁজি। বলল, সত্যি! সময় কেমন করে বদলে গেল। আগেকার দিনে কেউ ভাবতে পারত যাদের তুই-তোকারি সম্পর্ক তারা এই সব করতে পারে।

ঝিনুকও অস্ফুটে বলল, সময় বদলেছে, বড় দ্রুত বদলে গেছে সময়। আমরাও অজান্তে বদলে গেছি সঙ্গে সঙ্গে, আমাদের মা-বাবারাও বদলেছেন। তবে আমরা বোধহয় অনেক বেশিই বদলেছি। মানসিকতাতে, রুচিতে, পোশাকে-আশাকে জীবন-দর্শনে। আমার ঠাকমা কোনও অবাঙালি মহিলা সালোয়ার-কামিজ পরলে বলতেন আপ-কান্ট্রি ড্রেস। আর আজকাল গ্রামের স্কুলের মেয়েরাও সালোয়ার-কামিজ পরে স্কুলে আসার দাবি তুলছে।

—এখন চুপ কর তো তুই। স্কুল মাস্টারি করে করে রিয়্যাল দিদিমণি হয়ে গেছিস। এখন কথার সময় নয়, কাজের সময়। কথা বললে কনসেনট্রেশন নষ্ট হয়ে যায়। তবে এই ফাঁকে বলে নিই, আমি কিন্তু শাড়িতেই মেয়েদের অনেক বেশি সুন্দরী দেখি। টাকলু অবশ্য অন্য কারণে শাড়ি বেশি পছন্দ করে।

—কী কারণ?

—তুলে নিয়ে বিশ্বরূপ দর্শন করতে ঝামেলা কম। সালোয়ার-কামিজের অনেক হ্যাপা।

—যেমন তুই তেমন তোর বন্ধু! ইনোসেন্ট-লুকিং টাকলুকে দেখে তো বোঝা যায় না ও এমন মিশ্চিভিয়াস।

—মিশ্চিভিয়াস হবে কেন? ও সত্যিই ইনোসেন্ট। ওর মুখেন মারিতং জগৎ। ওর কৈশোরে কিছু একটা ঘটনা ঘটেছিল, অনুমান করতে পারি যার পর থেকে মেয়েদের সম্বন্ধে ওর একটা ভীতি জন্মে গেছে। শুধু কি পুরুষেরাই মেয়েদের ধর্ষণ করে? মেয়েরা করে না পুরুষদের? তাদের পোশাক-আশাকে, চলা-ফেরায়, অঙ্গভঙ্গিতে তো সবসময় প্রোভোক করেই, অনেক সময়ে ধর্ষণও করে বিশেষ করে নিজেদের চেয়ে কম বয়সী ছেলেদের।

—বাজে কথা বন্ধ কর তো।

—হ্যাঁ। কাজে মন দিই।

তারপরই বলল, আমার নিজের জীবনেই ঘটেছিল একবার, তাই জানি। আমার এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া। তিনি আমার বিয়েতে এসেছিলেন।

—তাই? কী জানি বাবা। আর বলিস না। শুনলেও গা ঘিনঘিন করে। তাঁর পরিচয়ও দিস না কখনও আমার কাছে।

—ঠিক আছে। তোর গা ঘিনঘিন করে আমার দিল হুমহুম করে।

রাতের কত প্রহরে যে দু'জনে দু'জনকে আতিপাতি করে ছাদ-ফুটো ঘরের কোণের ফিতে-কমানো লণ্ঠনের আলোয়, দু'জনকে খুঁজে, আবিষ্কার করে, আলিঙ্গন করে, অনেকবার নানা ছোট আদর আর বড় আদরে ভরিয়ে দিয়ে পুটুর পুটুর করে কথা বলতে বলতে, নগ্নশরীরের একে অন্যকে জড়িয়ে গায়ের উপরে কম্বল মেলে ঘুমিয়ে পড়েছিল তা নিজেরাই জানে না।

শোওয়ার ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ঘাসীরাম পোর্তে বারবার ডাকছিল, সাব। মেমসাব। ন বাজ গ্যয়ে হ্যায়। বাহার যাইয়েগা তো?

ঝিনুক কম্বলটা দিয়ে অনাবৃত শরীর গলা অবধি ঢেকে ফিসফিস করে বলল, তুই দরজা খুলে বাইরে গিয়ে কথা বল। আর চানের জল দিতে বল আমাদের। একেবারে চান করে তৈরি হয়ে ব্রেকফাস্ট করে বেরিয়ে পড়ব।

—চা টা খাবি? বেড-টি?

তা খেতে পারি। কিন্তু কাঁচের গ্লাসে করে দিতে বলিস। বিছানাতে শুয়েই খাব।

—ঠিক আছে। ●



সারা রাত বৃষ্টির পরে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। কলুষমুক্ত নীল আকাশে এখন দুধ সাদা মেঘপুঞ্জের খেলা। চারদিকের ক্লোরোফিল উজ্জ্বল প্রকৃতি ঝকঝকে রোদে হেসে উঠেছে। মনে হচ্ছে শরৎকাল এসে গিয়েছে। গাছে গাছে বুলবুলি, মৌটুসি, টুনটুনিদের ডাকে আর ফুরুৎ ফুরুৎ করে ওড়াতে প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠেছে বাংলোর হাতার পরিবেশ। আকাশে অনেক উঁচুতে ঈগল উড়ছে ঘুরে ঘুরে। তার ছায়াও ঘুরছে নীচে। ওরা দু'জনে বাংলোর সামনের সেই গোল ঘরে বসে আছে। ব্রেকফাস্ট ওখানেই নিয়ে আসবে গণা এবং পোর্তে। মুচমুচে করে ঘিয়ে ভাজা পরোটা করতে বলেছে ঝিনুক। সঙ্গে ঝাল এবং মাখামাখা আলুর তরকারি, ডিমের ভুজিয়া এবং ওর বাড়ি থেকে আনা আওলার আচার। বিলাসপুর থেকে সুভাষমামার দিয়ে দেওয়া কালাকাঁদও থাকবে। আজ সকালে কফি খাবে ওরা।

ভারি ভাল লাগছে ওদের। চান করে উঠে একটা ফলসা রঙা তাঁতের শাড়ি পরেছে ঝিনুক। ফলসা রঙা শায়ার নিচে ছাই রঙা নাইলনের প্যান্টি। প্যান্টি এর আগে এইভাবে দেখেনি ঝাঁজি। কাল নিজে হাতে ঝিনুকের প্যান্টি খোলবার সময়েই প্রথমে নজর করে দেখেছে। সব মেয়েরাই নিশ্চয়ই প্যান্টি পরে। কত কীই জানতো না ঝাঁজি। বিবাহিত-পুরুষ হওয়ার পরে মেয়েদের সম্বন্ধে অনেক অজানা তথ্য জানছে আর শিহরিত হচ্ছে। একটা ব্লাউজ

পরেছে ছাই রঙা, ছোট হাতার, তাতে সাদা লেস-এর ফ্রিল দেওয়া। কী পারফ্যুম মেখেছে ঝিনুক তার নাম জানে না ঝাঁজি কিন্তু ঝিনুকের চান করে ওঠা শরীরের সুগন্ধর সঙ্গে সেই পারফ্যুমের গন্ধ মিশে এই আরণ্যক আবহের গন্ধর মধ্যে তার নববিবাহিতা স্ত্রীর সামনে বসে ঝিনুকের উজ্জ্বল দুটো চোখের তারাতে তাকিয়ে শিহরিত হয়ে উঠছে ভাল লাগাতে ঝাঁজি।

—কী হলো তোর? সব সময়ে ঘাসীরাম পোর্তের মতো কলকলিয়ে কথা বলিস—এখন একেবারে চুপ মেরে গেলি কেন?

ঝিনুক বলল।

—দেখছি। ভাবছি। তাই কথা বলছি না।

—দেখছিস? কী দেখছিস?

—তোকে। সেই ক্লাস ফোর-ফাইভে পড়ার সময়ে তুই দু'বিনুনি করে স্কুলে আসতিস। পরতিস তো স্কুলের উনিফর্ম—পোশাকে চাকচিক্য তো দেখিনি। তার পরে উঁচু ক্লাসে উঠে পনিটেল করে আসতিস। তোর গ্রীবাটি মরালির মতো। গ্রীবা মেয়েদের শরীরের একটি আশ্চর্য সুন্দর জায়গা। সব মেয়ের এমন সুন্দর গ্রীবা হয় না। তার পরে আরও উঁচু ক্লাসে তো খোঁপা করে আসতিস। অমন সুন্দর চুল ছিল তোর কেটে ফেলে এখন মেমসাহেব হয়েছিস। কাছাকাছি থাকলে তো চুলের গন্ধ পেতাম। গা শিরশির করত সেই গন্ধে। কী তেল মাখতিস রে তুই?

—কেয়ো কার্পিন। একেবারে পাতলা তেল। চিটচিট করে না।

—আমি তো এলীন মাখি। এলীন তেল-এর গন্ধটা আমার খুব ভাল লাগে। তুই সম্ভবত চুল ছোট করে কেটে ফেলার পরে আর কোনও তেলই ব্যবহার করিস না, তাই না?

—আজকাল সকলেই শ্যাম্পু করে।

—কী শ্যাম্পু করিস তুই।

তিন বছর আগে লানডানে গেছিলাম। আমার চুলে খুসকি দেখে মেজকাকীমা হেড অ্যান্ড শোলডার শ্যাম্পু মাখতে দিয়েছিল। এখন তো কলকাতাতেও সব দোকানে পাওয়া যায়। সপ্তাহে তিনদিন শ্যাম্পু করি। যেদিন করি সেদিন অলিভ অয়েল গরম করে সকাল বেলাই মাথাতে মাখি, তারপর হেড অ্যান্ড শোল্ডার দিয়ে শ্যাম্পু করি।

আমার ঠাকুমা রিঠা ভিজিয়ে শ্যাম্পু করতেন। জেঠিমা শিকাকাই লাগাতেন। মা ডিমের কুসুম। দিনকাল কেমন বদলে গেল, না?

—তা তো বদলেছেই। জেঠিমা জ্যাঠাবাবুকে ডাকতেন 'শুনছ, ওগো' ইত্যাদি বলে। আড়ালে হয়তো নাম ধরে ডাকতেন। ঠাকুমা তো ঠাকুর্দার নাম ধরে কখনওই ডাকতেন না, বলতেন মেজকর্তা।

—সত্যি। পতিমাত্রই দেবতা ছিলেন। তখনকার দিনে স্বামী স্ত্রীর মধ্য বয়সেরও কত তফাত থাকত। ছ'-সাত বছর থেকে দশ-বারো বছর। স্ত্রীমাত্রই স্বামীকে মান্য করতেন। তাতে সংসারে শান্তিও থাকত। তাছাড়া মেয়েরা তাড়াতাড়ি বুড়ি হয়ে যায় বলে সব পুরুষের বউই তার নিজের তুলনাতে কমবয়সী থাকত। পুরুষের ছুকছুকানি তখন তাই অনেক কম হতো। স্বামী শব্দটার সত্যিই একটা গাম্ভীর্য এবং সম্ভ্রান্ততা ছিল, তাই না? হেড অফ দ্য ফ্যামিলি বলে সকলে সম্মানও করতেন। আর এখন তো সেই ফ্যামিলিই নেই। 'হাম দো ঔর হামারা দো'। স্বামী-স্ত্রী এখন বন্ধু, নাম ধরে তো ডাকেই, তু-তোকারিও করে। তার পর পান থেকে চুন খসলেই ছাড়াছাড়ি। স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর যৌথ পরিবারে দেখা হত, কথা হত, আদর-যতন সবই হত রাতের বেলাতেই। দাম্পত্যর মধ্যে একটা গোপনীয়তা ছিল, রহস্য ছিল। আর আজকাল সেই সম্পর্কটা খোলা হাটের মতো হয়ে গেছে। পান থেকে চুন খসলেই ডিভোর্স। প্রতিদিনই স্ত্রী ও পুরুষ অন্য অনেক পুরুষ এবং স্ত্রীর সঙ্গে মিশছে কাজের ক্ষেত্রে এবং অন্যত্র। দাম্পত্যর ফাঁক-ফোকর দিয়ে তাই স্বামী ও স্ত্রী ছাড়া অন্য কারও প্রবেশ ঘটছে। ঈশ্বর তো আমাদের কারওকেই স্বয়ংসম্পূর্ণ করে গড়েননি। অসম্পূর্ণতা প্রত্যেকেরই থাকে—শরীরে এবং মনেও। সেই অসম্পূর্ণতার ফাঁক পূরণ করবার জন্যে অন্য অনেক স্ত্রী পুরুষ হন্যে হয়ে থাকে। সুস্থ, সুন্দর, সুখী নিরুপদ্রব দাম্পত্যজীবন, আজকাল একটা মিথ হয়ে উঠছে। এখন দাম্পত্য বাঁচিয়ে রাখতে যত কষ্ট করতে হয়, যত টেনশন, আগে তো সেরকম ছিল না। আমাদের সকলের জীবনই একটা ঘূর্ণিঝড় হয়ে গেছে। মা-বাবার সঙ্গে আজকাল কম ছেলেই থাকতে চায়, তার জন্যে মেয়েরাই বেশি দায়ী।

ঝিনুক বলল, হয়তো তাই। তবে কী জানিস? প্রত্যেক মেয়েই তার নিজস্ব একটা সংসার চায়, নিজস্ব রান্নাঘর। নিজস্ব মতামত তাদের অত্যন্ত প্রখর। মা-বাবা তো দূরের কথা, দুই বিবাহিত ভাইও একসঙ্গে থাকতে চায় না। সকলেরই ব্যক্তি স্বাধীনতার তীব্রতা এতখানিই তীব্র হয়েছে যে অন্য কারও সঙ্গেই মানিয়ে থাকার মানসিকতা নষ্ট হয়ে গেছে পুরোপুরি।

—এটা হয়েছে কিন্তু মেয়েরা আর্থিকভাবে স্বাধীন হবার পরে। তাদের নবলব্ধ আর্থিক স্বাধীনতা তারা পুরোপুরি উপভোগ করতে চায়। অবশ্য দোষও দেওয়া যায় না। যুগের পর যুগ তোরা তো পরাধীন হয়েই থেকেছিস। নিজের নিজের হাতখরচের টাকাটাও স্বামীর কাছ থেকে চেয়ে নিতে হয়েছে। অনেক স্বামীই সে টাকা ভালোবেসেই দিয়েছেন স্ত্রীকে, কিন্তু অনেকে তো দেনওনি। মানুষখেকো বাঘ যেমন একবার মানুষের রক্তের স্বাদ পেলে অন্য কোনও জানোয়ারে খুশি থাকে না তোরাও একবার এই স্বাধীনতার স্বাদ পাওয়ার পরে তা অন্য কারও কাছেই সমর্পণ করতে রাজি নোস।

তারপর বলল, দু-দু'টো প্রমোশনের পর আমি আমার এখন যা 'টেকহোম' হয়, ফ্ল্যাট, গাড়ি, অন্য দশ রকমের পারকুইজিটস, তাতে তোর স্কুলের দিদিমণির চাকরিটা তুই অনায়াসেই ছেড়ে দিতে পারিস। তা হলে আমাদের দুটি সুন্দর ছেলেমেয়ে হতে পারে—যাদের বড় করে তোলার জন্যে—ভালভাবে মানুষ করার জন্যে তুই তোর সবটুকু সময় দিতে পারিস...

ঝিনুক বলল, নো-ওয়ে। এতখানি লেখাপড়া শিখে, পাঁচবছর চাকরি করে স্বাধীনভাবে বাঁচার পর হাউস-ওয়াইফ হয়ে থাকার কথা ভাবতেও পারি না।

—হাউস-ওয়াইফ হওয়ার মতো মহৎ ও সম্মানের আর কী হতে পারে তা তো আমি জানি না। আমার মা বা ঠাকমার জীবন যত সুখ-সম্মান ও আনন্দের ছিল আজকের দিনের কম স্বাবলম্বী মেয়েরই তা আছে।

—বলছিস বটে কিন্তু আমি যদি আহমেদাবাদের আইআইএম থেকে ম্যানেজমেন্টের ডিগ্রি নিয়ে এসে তোর মতো ব্যাঙ্কে চাকরি করতাম আর তুই যদি আমার মতো সাধারণ স্কুলশিক্ষক হতিস তবে তুই কি হাউস-হ্যাজব্যান্ড হয়ে যে ভূমিকা আমাকে পালন করতে বলছিস তা পালন করতে পারতিস? তোর সিগারেটের, বা পছন্দসই সিডি বা ভিভিডি বা তোর হুইস্কির জন্যে আমার কাছ থেকে হাত পেতে টাকা নিতে তোর বাধত না কি? ভেবে বল আমাকে। মেয়েরা চিরদিনই কেন ঘরের দায়িত্ব, সন্তানপালনের দায়িত্ব একাই নেবে? এই মানসিকতা তোদের বদলাবার সময় এসেছে।

তারপর বলল, এখন ভাবছি, বিয়ের ডিসিশনটা অত তাড়াতাড়ি না নিলেই বোধহয় ভাল হতো। তোর মধ্যে যে একজন গুহামানব, মান্ধাতার

আমলের পুরুষ বাস করে, তা তোর বাইরের আধুনিকতার মুখোশ দেখে এতদিন বোঝা যায়নি।

ঝাঁজি বলল, বিয়ে ব্যাপারটা এমনই যে তা করার আগে অনেক কিছুই বোধহয় ঠিকমতো জানা যায় না। মনের এবং শরীরের কমপ্যাটিবিলিটির ব্যাপারটা সম্পূর্ণভাবে সম্ভবত বিয়ের পরেই বোঝা যায়, আগে নয়। এই জন্যেই বোধহয় লোকে বলে শাদিকা লাড্ডু যো খায়া উও পস্তায়া ঔর যো নেহি খায়া উওভি পস্তায়া। তবে 'মুখোশ' শব্দটা তুই ব্যবহার না করলেই পারতিস। আমি আমার কোনওকিছুই তোর কাছে লুকোতে চাইনি। আমরা দু'জনে আলোচনাই করছিলাম শুধু। একে অন্যকে অবিশ্বাস বা আক্রমণ তো করতে চাইনি।

—সরি ঝাঁজি। রাগ করিস না। আমিও তোকে আহত করতে চাইনি। প্রার্থনা কর আমরা দু'জনে যেন আইডিয়াল কাপ্‌ল হয়ে উঠতে পারি নিজেদের সব পার্থক্য সত্ত্বেও। এইরকম ঝগড়া করেও, মতবিরোধ নিয়েও।

—ঠিক আছে। ওই দ্যাখ খাওয়ার নিয়ে আসছে ওরা।

দুটি ট্রেতে সব গুছিয়ে খাবার নিয়ে এলে ঝিনুক বলল, কফিটা পরে আনো। বানিয়ে আনতে হবে না। কফির কৌটো, কেটলিতে গরম জল, কাপ-ডিশ, ছোট চামচ এবং গরম দুধ এবং চিনি আলাদা আলাদা পটে করে নিয়ে এসো আমাদের খাওয়া হয়ে যাওয়ার পর।

গণা বলল, ঠিক হ্যায় মেমসাব।

পোর্তে বলল, আমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকি? কী লাগবে না লাগবে দেখার জন্যে।

ঝিনুক বলল, তার দরকার নেই। দশ মিনিট পরে এসে একবার দেখে যেও। তুমিও নাস্তা করে নাও। আমরা তো বেরোব নাস্তার পরই। মেন্ডিসেরাই না কী দেখাতে নিয়ে যাবে বললে যে।

—মেন্ডিসেরাই নয়, মেন্ড্রিসেরাই।

বলে, পোর্তে চলে গেল।

—মানুষটার সব ভাল কিন্তু একটু ওভারবিয়ারিং, নিজের ওজন বোঝে না।

—ওই হল।

ঝিনুক স্বগতোক্তি করল। তারপর বলল, মোগলসরাই হলেও ক্ষতি ছিল না।

ঝাঁজি বলল, সরাই মানে সরাইখানা। হোটেল। আর শুনলি না, কাল পোর্তে বলল, সেরাই মানে শাল গাছ।

খেতে খেতে জঙ্গলের দিকে চেয়ে ঝাঁজি বলল, কাল রাতের কথা ভাবছি।

—কী ভাবছিস?

—ভাবছি তুই যে এত সুন্দর তা তোকে এত বছর ধরে দেখেও বুঝতে পারিনি। আবরণের আড়ালে সৌন্দর্য যে আশ্চর্যভাবে লুকোনো থাকে তা কারোকে নিরাবরণ করে না দেখলে ধারণাই করা যায় না।

—মানে?

খাওয়া থামিয়ে বলল ঝিনুক।

—না, মানে তুই তো সুন্দরীই। তোর শ্যামল বরনেই তুই আমার কাছে খুবই সুন্দর। কিন্তু তোর শরীরের যে সব জায়গা সবসময়ই ঢাকা থাকে সে সব জায়গা তো রীতিমতো ফর্সা—শুধু ফর্সাই নয়, কেমন একটা রহস্যময়, আভা বিচ্ছুরিত হয় সে সব জায়গা থেকে।

—সে সব জায়গা মানে?

—মানে কি বিস্তার করে বলতে হবে?

—বলই না। আমি বোকা বলেই হয়তো কী বলছিস তা বুঝতে পারছি না।

—এই তোর স্তন, স্তনসন্ধি, উরু, তলপেট, উরুসন্ধি..

এবারে থামবি—

তারপর বলল, স্তনসন্ধি, উরুসন্ধি এসব শব্দ তুই কোথায় শিখলি?

—বাঃ রে! স্কুল জীবন থেকে লিটল্ম্যাগ করছি আর বিভিন্ন নামী অনামী কবির কবিতায় আকছার ব্যবহৃত ওই শব্দগুলো জানব না?

—এই কবিতা-বিলাসই বাঙালি জাতটাকে মারল।

—অথবা বাঁচাল হয়তো। কে বলতে পারে। এই হতভাগ্য সর্বস্বহৃত জাতটার যদি কবিতা লেখার ক্ষমতাও না থাকত, যদি না থাকত স্বপ্নবিলাস, না থাকত সেন্স অফ হিউমার, তবে এ জাত কবেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। কলকাতার ট্রামে-বাসে-লোকাল ট্রেনে বাদুড়ঝোলা হয়ে প্রাণ হাতে করে ঝুলতে ঝুলতে প্রতিদিন যাওয়া-আসা করতে করতেও যে জাত তার রসবোধ অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে তাকে বাহবা না দিয়ে উপায় কী? নকশাল আন্দোলনও তো ওইরকম এক স্বপ্নবিলাস থেকেই জন্মেছিল। বুকের রক্ত

দিয়ে সুমনদাদের মতো কত মেধাবী তরতাজা যুবক তাদের স্বপ্নের দাম দিয়েছিল।

—সত্যি। তুই প্রেসিডেন্সি কলেজে গেছিলি বলে আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত না থাকলেও সেই ট্র্যাডিশান সম্বন্ধে পুরোপুরি অবহিত ছিলি।

—আমি তো সেদিনের ছাত্র। আমরা যখন কলেজে ভর্তি হই তখন নকশাল আন্দোলন ইতিহাস হয়ে গেছে। নকশালবাড়ি থেকে তখন শ্রীকাকুলাম হয়ে নানা জায়গাতে ছড়িয়ে গেছে সেই আন্দোলন।

—এখন তো নকশাল আন্দোলন বলে না, নাম হয়েছে এমসিসি। সব জায়গার সরকারই তা শক্ত হাতে দমন করবার চেষ্টা করেছেন এবং করছেনও। এই সন্ত্রাসবাদ তো সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে গেছে—এমসিসির কথা বলছি না।

ঝাঁজি বলল, সন্ত্রাসের মধ্যেই সন্ত্রাসবাদের বীজ সুপ্ত থাকে। অন্যায় হলে তার প্রতিবাদ হিসেবে অন্য অন্যায় সংঘটিত হয়।

—কিন্তু এই প্রক্রিয়াতে তো সব দেশেই কত অগণ্য নিরপরাধ মানুষের প্রাণ যাচ্ছে।

—তা তো যাবেই। তা ঠেকানোর কোনও উপায় নেই।

—থাকগে, অন্য কথা বল। কোনও দম্পতি হানিমুনে এসে এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করে কখনও শুনিনি। তুই একটা যা-তা।

—হব হয়তো। গত বছর স্টেটস-এ গেছিলাম অফিসের কাজে। কানসাস সিটিতে সুমনদার এক বন্ধুর সঙ্গে আলাপ হল। প্রাসাদোপম বাড়ি, মার্সিডিজ, বিএমডাব্লু গাড়ি, যোধপুর পার্কের এক কোটিপতির রূপসী এবং ন্যাকা বউ এবং দু-দুটি বলবান শিশুপুত্র নিয়ে অপার আনন্দে দিন কাটাচ্ছে, ক্যাপিটালিস্ট-এর চরম উদাহরণ হয়ে, টাকা ছাড়া আর কিছু বোঝে না। নকশাল আন্দোলনের আগুনে যারা পুড়েছিল একদিন তাদের মধ্যে অনেকেরই এমন পরিণতি দেখে আন্দোলনটার যাথার্থ্য সম্বন্ধেই সন্দেহ জাগে মনে মনে কখনও কখনও।

ঝিনুক বলল, কয়েকজন নীতিহীন সুবিধেবাদী স্বার্থপর মানুষ একদিন সেই আন্দোলনে শামিল হয়েছিল বলেই আন্দোলনটা মিথ্যে হয়ে যেতে পারে না। কত ছেলেমেয়ে মারা গেছিল, অত্যাচারিত হয়েছিল, সে কথাও ভাব। আন্দোলনের উদ্দেশ্যই যদি মিথ্যা হয়ে যায় তবে তাদের সকলের

আত্মত্যাগও তো মিথ্যে হয়ে যায়। না, আমার তা মনে হয় না। তোর সুমনদার সেই বন্ধু Blacksheep।

—তাকে তুই গলা টিপে মেরে দিয়ে এলি না কেন? আমি নকশাল আন্দোলন করিনি কখনও। তখন আমি স্কুলের নিচু ক্লাসে পড়তাম, তুইও তাই, কিন্তু আমি যদি তোর সুমনদার মতো কারোকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতাম তবে আমি তার সেই বন্ধুকে নিজে হাতে খুন করে আসতাম।

এমন সময় দেখা গেল প্লেটে আরও পরোটা তরকারি এবং কালাকাঁদ নিয়ে গণা এবং পোর্তে আসছে এ দিকে।

ঝিনুক বলল, আর না। খেয়েই দেখছি মরে যাব।

—আর একটা করে নিন অন্তত। দুপুরে কেঁওচিতে কখন পৌঁছব না পৌঁছব তার কি কোনও ঠিক আছে?

ঝাঁজি বলল, আমরা যখন অমরকণ্টকে যাব তখন তো কেঁওচি হয়েই যেতে হবে। অমরকণ্টক তো এখান থেকে অনেক দূরও। তবে সেদিনই না হয় কেঁওচিতে খাওয়া যাবে দুপুরে এবং সেখানে দু দিন থেকে ফেরার পথেও। কাল মুরগির রোস্ট আর পুডিংটা জব্বর রেঁধেছিল গণা। আজ দুপুরেও পাতলা করে মুরগির ঝোল করতে বলো।

ঝিনুক বলল, সঙ্গে অড়হরের ডাল, একটা সবজি, কাঁচা আমের চাটনি কাঁচালঙ্কা দিয়ে। ধনেপাতা তো এখন পাওয়া যাবে না, না?

—না। ধনেপাতা পাওয়া যাবে না তবে কারিপাতার গাছ তো এই বাংলোর হাতার মধ্যেই আছে। ধনেপাতার বদলে কারিপাতা দিয়ে করা যাবে।

—এঁচড় কি পাওয়া যাবে?

—হ্যাঁ।

—তবে আর কী? রাতে গাছ-পাঁঠার তরকারি করতে বোলো। একেবারে মাংসের মতো করে রাঁধতে বলবে।

—আর কী?

—কারিপাতা দিয়ে ডিমের কারি। জমে যাবে।

ঝাঁজি বলল।

পোর্তে বলল, আজকের দিনটা একটু কষ্ট করুন। কাল ভোরে উঠে আমি শেওতারাই চলে যাব। সেখান থেকে ভাল মাছ নিয়ে আসব।

—কী মাছ?

—পাকা রুই অথবা কাতলা। বিলাসপুর থেকে চালান আসে। বিলাসপুরে অনেক বড় বড় দীঘি আছে। বিলাসপুর থেকে মাচ নিয়মিত কলকাতাতেও চালান যায় আর কালকে অচানকমারে হাটও আছে। তবে হাট জমতে জমতে বিকেল হয়ে যায়। কারোকে টাকা দিয়ে আসব সে পাঁঠা আর শুয়োরের মাংস কিনে এনে দেবে লামনিতে।

হাটই যদি বসে তবে আমরাই যাব। জঙ্গলের মধ্যে ছোট জায়গার হাট দেখার মতো। নানারকম গয়না, হাতে বোনা তাঁতের দোহর, বাঁশের নানা জিনিস এবং আরও অনেক কিছু পাওয়া যাবে। গরুর গলার ঢোকরার ঘণ্টা। কলকাতাতে আমাদের নতুন ফ্ল্যাটের ডোর-বেল হিসেবেও ব্যবহার করতে পারিস।

--তাই? উত্তেজিত গলাতে বলল ঝিনুক। তারপর বলল, তুই এত সব জানলি কী করে?

বললাম না, বড়মামার সঙ্গে অনেক জঙ্গলে গেছি যে ছেলেবেলা থেকে।

বাঃ। তোর কী মজা!

মজা কী? বাবা খুব রাগ করতেন। শ্লেষের সঙ্গে বলতেন 'নরানাং মাতুলক্রমঃ'।



লামনি বাংলো থেকে বেরিয়ে অচানকমারের দিকে পিছনপানে একটু গিয়েই লামনি বনের বন-নাকা পড়ে। সেই নাকার পাশে বনবিভাগের কোনও বাবুর পোষা একটি ছোট্ট লালচে বাঁদর লোহার চেইন-এ বাঁধা আছে। গাড়ি ও ট্রাক পারাপারের জন্যে নাকাটার শাল-কাঠের লাটাখাম্বাটা তোলা হলেই সে চোখ-মুখ বিস্ফারিত করে কিঁচি-কিঁচি-কিচর আওয়াজ করে বাঁদরামি করে। কারই না নিজের পূর্বপুরুষের এমন উলঙ্গ উল্লম্ফনরত মূর্তি দেখতে ইচ্ছে করে?

সেই নাকাটা পেরিয়ে অচানকমারের দিকে সামান্য এগিয়েই পোর্তে গাড়ি বাঁ-দিকে জঙ্গলের মধ্যের পথে ঘোরাল। নাকা থেকে একজন গার্ড উঠে পোর্তের পাশে বসল। সামনেই আর একটা তালাবন্ধ নাকা আছে সেটার তালা খুলে দেবে বলে।

ঝিনুক নাক টানছিল। ঠান্ডা লেগেছে একটু। তা ছাড়া কলকাতাতে গিজারের অঢেল গরম জলে চান করে অভ্যেস। লামনিতে এক বাল্টি গরম জলেই চান সারতে হচ্ছে। অবশ্য শীতকাল তো এখন নয়। ক'দিন পরেই হোলি। তবে মধ্যপ্রদেশের মাইকাল পর্বতমালার পাদদেশের এই আদিগন্ত আরণ্যক পরিবেশে বসন্ত আসার দেরি আছে। পূর্বী পশ্চিমবঙ্গে বসন্ত অনেক তাড়াতাড়ি আসে।

ঝিনুকের ঠান্ডা লাগার আরও একটা কারণ ছিল। ফাটা ছাদ দিয়ে বৃষ্টির জল বিছানাতে পড়াতে বিছানাটা ভিজে গিয়েছিল। তবে নববিবাহিত দম্পতির বোধহয় সমুদ্রে শুয়ে রাত কাটালেও ঠান্ডা লাগে না। সুভাষমামা অথবা কনসার্ভেটর সাহেব নিশ্চয়ই জানেন না যে লামনি বাংলোর এই অবস্থা। জানলে, জেনেশুনে তাঁরা নিশ্চয়ই ওদের ওখানে পাঠাতেন না। বাংলোর ভিতরের চেহারা এবং গণা গোন্দের ঐ অপেশাদারি, অনিচ্ছুক ব্যবহার দেখেই বোঝা যায় যে এ বাংলোতে কেউই থাকেন না। বনবিভাগের আমলারা তো থাকেনই না, থাকলে, এমন হাল হতো না বাংলোর। তবে এসব কারণেই ঝাঁজি আর ঝিনুকের এতো ভাল লেগে গেছে লামনি। এ বাংলোতে আর কেউ যে নেই এবং আর কেউ আসবেও না, এটা জানাটাই ওদের কাছে মস্ত জানা। পরম স্বস্তির উৎস।

বন-বাংলোর ছাদ দিয়ে যে জল পড়ে ঘরের মধ্যে টুপটুপিয়ে তার কারণও অবশ্য আছে। সামনের বারান্দার দেওয়ালে একটি মার্বেলের ফলক আছে। তাতে বাংলোর জন্ম-বৃত্তান্ত, হিন্দিতে যাকে বলে 'জনমপত্রী' তা লেখা আছে। বিহার এবং অধুনা ঝাড়খণ্ডের নানা বন-বাংলোতেই দেখেছে ঝাঁজি বড়মামার সঙ্গে গিয়ে যে এই রকমই ফলক থাকে অধিকাংশ বাংলোতেই।

উনিশশো তেরোর জুন মাসে ওই বাংলো বানানো হয়েছিল। বাবুর্চিখানা ও চারধারের বারান্দা নিয়ে কম করে চারহাজার বর্গ ফিট মতো হবে কভারড এরিয়া। সাকুল্যে খরচ পড়েছিল তিন হাজার পঞ্চাশ টাকা আট আনা। পোর্তে বলছিল, এখন এখানে এই বাংলো বাবুর্চিখানা, গারাজ, সামনের বিশ্রাম ঘর ইত্যাদি বানাতে খরচ পড়বে কমপক্ষে পাঁচ-ছ লাখ টাকা। নিট খরচ। কিন্তু স্যাংশন হত কম করে আরও দু'লাখ বেশি। বনবিভাগের বড় ছোট আমলারা হাতিয়ে নিতেন কম করেও এক-দেড় লাখ আর ঠিকাদারের পকেটে যেত বাকিটা। ব্রিটিশ আমলে স্বচ্ছতা ছিল—যদিও তারা ভারতবর্ষ লুঠ করতেই এসেছিল—তাদের আমলে সরকারের সব বিভাগের সর্বস্তরের আমলাদের অধিকাংশই স্বাধীনতার পাঁচ যুগ পরে খাঁটি ভারতীয় ঐতিহ্যে এমন চক্ষুলজ্জাহীন এবং আত্মঘাতক অসৎ ছিল না। চাবুকের ভয় ছিল, চাকরি যাবার ভয় ছিল। রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা'র ধনঞ্জয় বৈরাগী সেই যে "ভয় জাগিয়ে রাখার" কথা বলেছিলেন না, তার মতো ধ্রুব সত্য বুঝি আর হয় না। স্বদেশে চাবুক হাতে উপরে কেউ না দাঁড়িয়ে থাকলে, সে ইংরেজ

প্রভুই হোক কী জরুরি অবস্থাকালীন ইন্দিরা গান্ধী, কাজ এবং সততা সরকারি কর্মীদের অধিকাংশের কাছ থেকেই প্রত্যাশার নয়।

ফরেস্ট গার্ড ওই গেট খুলে দিয়েই নাকাতে ফিরে গেল। নাকাতে অনুপস্থিত থাকা মানেই ঘুষ-ঘাষের ঘরে খামতি। তার প্রাপ্য অন্যে মেরে দেবে।

জঙ্গল এদিকটাতে ফাঁকা হয়ে গিয়েছে। পিচ রাস্তা দিয়ে নানা আমলার যাতায়াত তাই সেখানে পথের দু'পাশে যতদূর চোখ যায় নিবিড় অরণ্য। পোর্তে বলছিল, অনেক মানুষের মাথাতে সামনের দিকে ঘন চুল আর ভিতরে যেমন টাক থাকে এখনকার-জঙ্গলগুলির তেমনই অবস্থা। অরণ্যনিধনে কোনও রাজ্যই পিছিয়ে নেই। ঐ নিবিড় অরণ্য অধিকাংশ জায়গাতেই মাথার সামনের চুলের মতো।

ঝাঁজি ভাবছিল, স্বাধীনতার পরে আমরা নিজে হাতে নিজেদের দেশের যে ক্ষতি করেছি তেমন ক্ষতি করার কথা অন্য কোনও স্বাধীন দেশ হয়তো ভাবতেও পারত না। স্বাধীনতার পরে অনেক কিছু যেমন হয়েওছে, পথ-ঘাট দালান-বাড়ি, কারখানা, জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র ইত্যাদি তেমন নষ্টও হয়ে গিয়েছে। বিশেষ করে সাম্প্রতিক অতীত থেকে লক্ষ্য করছে, টিভি আসার পরে, এক সর্বগ্রাসী লোভে আকণ্ঠ ডুবে গেছে মানুষ। সব রাজ্যের রাজধানী এবং সদর মফস্বল শহরের মানুষেরা পুরোপুরি ভোগসর্বস্ব হয়ে গিয়েছে অথচ তারা দেশের মোট জনসংখ্যার কত ভাগ? আসল ভারতবর্ষ, গ্রামীণ ও আরণ্যক ভারতবর্ষের সিংহভাগটাই যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গিয়েছে। আজও প্রতি রাজ্যে না-খেয়ে, বিনা চিকিৎসাতে মানুষ আকছার মরে। মাঝে মাঝেই মনে হয় ঝাঁজির, এ সব কথা, অবকাশ হলে। সুমনদাদের মৃত্যু কি তা হলে বৃথাই হয়েছিল? কে জানে! হয়তো বৃথা হয়নি। তাদেরই রক্তবীজ থেকে আজকের মাওবাদীরা জন্মেছে। আইনসঙ্গতভাবে বেঁচে থাকার ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধার সবই যদি তামাশামাত্রই হয়, এবং যাদের যেন-তেন প্রকারেণ উপার্জিত অঢেল পয়সা আছে শুধুমাত্র তারাই সেই তামাশা দেখতে পারে, সুযোগ-সুবিধা পেতে পারে, তা হলে এই স্বাধীনতার দাম কী? ফিলিপিনস-এর বিপ্লবীরা বলতেন, দেশ যদি সকলের দেশ না হয় সে দেশ দিয়ে আমাদের দরকার কী? স্বাধীনতার এত বছর পরেও সব ক্ষমতার উৎস যদি বন্দুকের নলই হয় তবে মিথ্যে শান্তি দিয়ে কী হবে?

—কী ভাবছিস রে? একেবারে চুপ মেরে গেলি যে।

ঝিনুক বলল।

—এই।

—এই কী?

দেশের কথা ভাবছি। তা ছাড়া—চোখ দিয়ে পোর্তের দিকে ইশারা করে ইংরেজিতে বলল—টকিং-মেশিন যখন সঙ্গে আছে তখন আমরা নীরব থেকে জায়গা সম্বন্ধে যতটুকু জানা যায় তা জেনে নেওয়াই ভাল।

—কলকাতাতে ফিরে গিয়ে তুই কি কোনও পত্র পত্রিকাতে এই অরণ্য ভ্রমণ-নিয়ে লিখবি নাকি কিছু?

—নাঃ। এখন ভ্রমী মানুষের সংখ্যা এতই বেড়ে গেছে, অরণ্যের ফোটো এবং অরণ্য-ভ্রমণ সংক্রান্ত এত লেখা প্রতিদিন প্রকাশিত হচ্ছে, তার উপরে টিভির নানা চ্যানেল তো আছেই, যে এখন অরণ্যর সেই রহস্যময়তাই যেন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অরণ্য দর্শনেও পুরী বা দেওঘর বা গয়ার মতো পাণ্ডারাই পাণ্ডামি করছে। আর সব ভ্রমণই 'বুড়ি ছোঁয়া' হয়ে গেছে। সে কেদার-বদ্রীই বল, পালামৌই বল আর অরাকুভ্যালিই বল। পশ্চিমী দেশ থেকে এই প্যাকেজ ট্যুর এর কনসেপ্টটা ভ্রমণের আসল মজাই নষ্ট করে দিয়েছে। ভ্রমণকারীর চেয়ে ভ্রমণ বিশারদ এখন দেশে বেশি হয়ে গেছে। এই প্রেক্ষিতে এই ছাদ-ফুটো অখ্যাত লামনি বাংলোতেই থাকবি বলে যে ডিসিশনটা তুই নিয়েছিস তা আমি মনেপ্রাণে সমর্থন করি।

—একটি জায়গাতেই এমন করে ক'দিন থাকলে তবেই না তাকে বলে 'ড্য মে হ্যাভ ফীল অফ দ্য প্লেস' হতে পারে, নইলে নিরন্তর ঘোড়া দাবড়ে বেড়িয়ে লাভ কী? কীটস্, বায়রন, টেনিসন, হেনরি ডেভিড থরো, ওয়াল্ট হুইটম্যান, আধুনিক কালের রবার্ট ফ্রস্ট-এর লেখা পড়লে প্রাকৃতিক অভিঘাত কাকে বলে তা বোঝা যায়। জিম করবেট-এর লেখা পড়লেও বোঝা যায়।

—অবশ্যই। কিন্তু তুই দিশিদের লেখার কথা বলছিস না কেন? তাঁদের লেখা পড়েও কি আমরা শিখিনি কিছু? বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পালামৌ। বিভূতিভূষণের বহু বই, সরলাদেবীর জলবনের কাব্য, শিবশঙ্কর মিত্রের আর্জান সর্দার।

ঝিনুক বলল।

—সে তো অবশ্যই। আরও কত লেখক, কত বইয়ের নাম করা যেতে পারে। অরণ্যে ক্যামেরা হাতে দাপাদাপি করে বেড়ালেই অরণ্য ভ্রমণ হয় না। বড়মামা বলতেন, বুঝলি রে ঝাঁজি, অরণ্য ভ্রমণ একটা আর্ট, একটা পজিটিভ প্যাশন, বাংলাতে আধুনিক কবিরা যাকে বলেন 'লিপ্ততা'। বনকে মন দিতে হয়। এও একরকমের কোর্টশিপ। অনেক সময়সাপেক্ষ এ—গভীর ভালবাসার ব্যাপার। পুঁটিমাছের মতো অল্প জলে ছরছরিয়ে বনের মন পাওয়া যায় না। কবি যেমন করে তাঁর প্রেমিকাকে দেখেন, তোকেও তেমন করেই বনকে দেখতে হবে। তবে তো মন পাবি।

—তোর বড়মামা যদি এতই ভালবাসতেন বনকে তা হলে শিকার করার মতো নিষ্ঠুর কাজ করতেন কী করে?

—আরে! বড়মামা হেসে বলতেন, বুঝলি রে ঝাঁজি, অধিকাংশ মানুষই মাথা-মোটা। আমি শিকার করি বলে তারা দোষে আমাকে। আরে শিকারটা তো একটা ছুতো, অ্যালিবাই, কোনও না কোনও ছুতো না করে জঙ্গলে আসি কী করে। লোকে পাগল ঠাউরাবে যে! শিকারের নাম করেই আসি, শিকার কি করি তেমন? নানা বনের মধ্যে চুপচাপ কটা দিন চওড়া বারান্দাতে বা গাছতলাতে বা ঝর্নাতলাতে বসে একটু হুইস্কি খাই আর Introspection করি। Contemplationও। বনে এলেই বুঝি, সাধুসন্ত মুনিঋষিরা কেন জঙ্গলে পাহাড়ে একা একা থাকেন। আসলে এটা একটা রিয়্যালাইজেশনের ব্যাপার। নির্জনতা কখনওই আমাদের খালি হাতে ফেরায় না।

—বাঃ ভারি সুন্দর কথা তো।

—আরে আমাকে দেখে বড়মামাকে জাজ করিস না। এক এনিগম্যাটিক চরিত্র ছিলেন বড়মামা। তোর দুর্ভাগ্য যে তাঁকে কাছ থেকে জানার সুযোগ তোর হল না। প্রচণ্ড পড়াশোনা ছিল। কলকাতার লিডিং ব্যারিস্টার হয়েও সাহিত্য এবং অন্য নানা বিষয়ের অত বই পড়ার সময় উনি কী করে বের করতেন সেটা ভাবলেই অবাক হতেন সকলে। বড়মামার দুই লিগ্যাসী পেয়েছি। সরি, দুই নয়, তিন।

—কী? কী?

—জঙ্গলের নেশা, বইয়ের নেশা আর হুইস্কি।

তারপর হেসে বলল ঝাঁজি, একদিন এক মক্কেল ওঁকে বলেছিলেন, আপনাকে এক পেটি স্কচ-হুইস্কি পাঠাব স্যার, আপনার জন্মদিনে। বড়মামা

খুব জোরে হেসে উঠে বলেছিলেন, স্কচ-হুইস্কিটা আবার কী ব্যাপার মশায়। হুইস্কি মানে তো আমি স্কচই বুঝি।

ঝিনুক বলল, কেন স্কচ ছাড়াও তো হুইস্কি হয়। আমেরিকান বুর্বোর্ন, জাপানি সানটোরি।

—তুই জানলি কী করে?

—বম্বের তাজ-এর মেনুকার্ড-এ দেখেছি—মানে ড্রিঙ্কস-এর। বাবার সঙ্গে যখন গোয়া গেছিলাম তখন বম্বেতে ছিলাম তিনদিন। তাজ-এর ওল্ড উয়িং-এ।

আর গোয়াতে কোথায় উঠেছিলি?

—প্রথম তিনদিন ছিলাম বগম্যালো বিচ-এর উপরে ওবেরয় গ্রুপের বগম্যালো হোটেলে। তার পরে তাজ গ্রুপের ফোর্ট আগুয়াডাতে।

ওঃ একেবারে আউট অফ দ্যা ওয়ার্ল্ড প্লেস।

ঝাঁজি বলল, আমি তো তোকে বলেইছিলাম। আমরাও গোয়াতে গিয়ে ফোর্ট আগুয়াডাতে থাকতে পারতাম। তুইই তো বললি, না, মধ্যপ্রদেশের কোনও অচেনা-অজানা বন-বাংলোতে হানিমুন করবি।

—বলে তো ছিলামই। তুইও তো বন ভালবাসিস। কেন? তোর কি লামনি ভাল লাগছে না।

—যেখানে ঝিনুক থাকে ঝাঁজিও সেখানে থাকবেই। ঝাঁজির বুকেই এ ঝিনুক থাকে। দা-রু-ন ভাল লাগছে রে। কাল রাতের বৃষ্টিভেজা বিছানার কথাটা সারাটা জীবন মনে থাকবে।

ঝিনুক দার্শনিকের মতো বলল, কে জানে। আমাদের সারাটা জীবন কত দীর্ঘ হবে।

—ম্যারেড লাইফের কথা বলছিস? তুই কি এখনই ডিভোর্স-এর কথা ভাবছিস না কি?

—আঃ। ঝাঁঝি।

ঝিনুক চাপা ধমকের মতো করে বলল ঝাঁজিকে। ইশারাতে পোর্তেকে দেখাল।

তারপর বন্ধু কিন্তু নতুন বরকে একটা ধমক দিয়ে খুব ভাল লাগল ঝিনুকের। বিয়েটা শরীর এবং মনের ভালবাসার অধিকার যেমন দেয় তেমন শাসন করার অধিকারও দেয়। অনিমাদি যেমন করে ওঁর ভীষণ প্রিয় 'পুডল'

কুকুরটাকে নিজের কোলের উপরে বসিয়ে আদরের ধমক দেন, ঝিনুকও তেমনি করে ধমকাবে ঝাঁজিকে। কিন্তু ঝাঁজি কি বুঝতে পারবে যে ধমকটাও ভালবাসার একটা রকম। বিশেষ রকম।

ঝাঁজি দু'পাশে চেয়ে বলল, কীরকমভাবে গাছ কাটা হয়েছে দু'পাশে দেখছিস? বড় গাছ তো আর নেই বললেই চলে।

—বন বিভাগই কেটেছে হয়তো নিজেদের আয়ের জন্যে।

—নারে। নিজেরা কাটলে ওরা দু'রকমভাবে কাটে।

—দু'রকম মানে কী কী রকম?

—কোনও বনভূমির কোনও বিশেষ অংশের গাছেরা যখন পরিণত হয়ে যায়, বিশেষ করে সেগুন ও শাল, তখন ওঁরা ক্লিয়ার ফেলিং করেন। মানে ওই নির্বাচিত বনের একটি অংশের সব গাছ কেটে ফেলে বিক্রী করে দেন বা ঠিকাদারকেই কাটার ভার দিয়ে দেন নীলাম ডেকে। ওই নির্বাচিত অংশটি গাছ-শূন্য হয়ে গেলে অনেক সময় ফাঁকাই ফেলে রাখেন।

—কেন?

—তৃণভূমির জন্যে। কী ধরনের প্রাণী সে জঙ্গলে আছে তা তো তাঁরা জানেনই। তাঁদের বিচরণভূমি, দৌড়াদৌড়ি করে খেলার জন্যে এবং ঘাস খাবার সুবিধার জন্যেই অমন করেন। নইলে ওই অংশে আবার নতুন করে গাছের চারা লাগান। তাকে বলে, প্ল্যানটেশন। সেগুন গাছ বড় হতে অনেক সময় নেয়। কিন্তু শাল গাছ তাড়াতাড়ি বাড়ে।

তারপর বলল, এখনকার মধ্যপ্রদেশের নাম, বড়মামার কাছেই শুনেছি, ব্রিটিশ আমলে ছিল সেন্ট্রাল প্রভিন্সেস। সংক্ষেপে সি.পি.। এই সিপি টিক খুব বিখ্যাত ছিল। তুই তো জানিসই ফার্নিচার সবচেয়ে ভাল হয় সেগুন কাঠে।

—কেন? মেহগনী, রোজউড, আরও কত গাছ আছে যা দিয়ে ভাল ফার্নিচার হয়।

—তা হয়তো হয় কিন্তু কোনও বনেই মেহগনী অথবা রোজউডের প্ল্যানটেশন হয় বলে জানি না। অবশ্য আমি আর কতটুকু জানি। হয়তো হয় কোথাও। সিপি টিক, সেগুনের ইংরেজি নাম টিক, ভাল হয় বটে, কিন্তু পূর্বী দুনিয়াতে সবচেয়ে ভাল সেগুন হয় বার্মাতে, এখন যে দেশের নাম মিয়ানমার। বার্মা আর ভারতের সীমান্ত হচ্ছে মণিপুর। এই মণিপুরের সেগুনও খুব ভাল হয়।

—তুই কখনও গেছিস মণিপুরে?

—একবার গেছিলাম বড়মামার সঙ্গে। মণিপুর আর বার্মার সীমান্তের গ্রাম 'মোরে'তে ছিলাম পাহাড়ের উপরের দারুণ ডাকবাংলোতে। পাসপোর্ট ভিসা ছাড়াই বার্মাতেও চলে গেছিলাম। মণিপুর-বার্মা সীমান্তের প্রথম যে গ্রাম তার নাম 'তামু'। সেখানে প্যাগোডা ছিল একটা। সুন্দরী মেয়েরা এক ঝাঁক রঙিন প্রজাপতির মতো কলতলাতে জল নিচ্ছিল। এখনও সে ছবি ভাসে চোখে। মায়ের জন্যে তামু থেকে কাঠের কাঁকই কিনেছিলাম।

—কাঁকই মানে?

—তাও জানিস না? কাঁকই মানে চিরুনি। শব্দটা তো বাংলাই।

—তাই?

—ইয়েস ম্যাম।

—সত্যি! তুই কত জায়গাতেই যে গেছিস!

—তা গেছি, তবে বড়মামারই দয়াতে। বড়মামা আমাকে খুবই ভালবাসতেন। তাঁর তো ছেলে ছিল না। বড়মামা বলতেন, "ট্রাভেলিং ইজ এডুকেশন।" দেশ ভ্রমণের মতো শিক্ষা আর কোনও কিছুতেই হয় না। বই পড়েও হয় না।

—তা ঠিক।

—ক্লিয়ার ফেলিং-এর কথা তো বললি, অন্যরকমের কথাটা তো বললি না।

—হ্যাঁ। অন্যরকমকে বলে কপিস-ফেলিং।

—ক'পিস ফেলিং?

—ঝাঁজি হেসে বলল, না রে। কপিস ফেলিং মানে বনের মধ্যের পরিণত গাছ বেছে বেছে সেই গাছের গায়ে বনবিভাগের মানুষেরা মার্কা মেরে দেন। তারপর সেইসব গাছ কাটেন ঠিকাদারেরা। সাধারণত হরজাই জঙ্গলেই এমন ফেলিং হয়। যেখানে কপিস ফেলিং হয় সেখানে জঙ্গলটা একটু পাতলা হয়ে যায়, এই আর কী। বনের স্বাস্থ্য এবং বনবিভাগের স্বাস্থ্যের কারণেই অমন করা হয় আর কী।

—হরজাই জঙ্গল মানে কী?

—হরজাই মানে মিসেলেনিয়াস। কী অবস্থা তোদের। ইংরেজি শব্দ দিয়ে বাংলা শব্দের মানে বোঝাতে হচ্ছে।

—তা তো হল। পোর্তে তোমার মেস্ত্রিসেরাই আর কত দূরে?

—এই সামনেই মেমসাহেব। কাল রাতে আপনারা হয়তো লক্ষ্য করেননি, এই গাছটার একটা ফোটো আছে খানাকামরাতে—সিসিএফ সাহেবের তোলা। আজ ফিরে গিয়ে দিনের আলোতে ভাল করে দেখবেন।

কিছুক্ষণ পরে গাড়ি থামাল পোর্তে।

ঝাঁজি বলল, এখানে আসার আগে পথের দু'পাশেই দেখলি জঙ্গল প্রায় ন্যাড়াই হয়ে গেছে। বনবিভাগের ইচ্ছাতেই তা কাটা হয়েছে, না গাছ চুরি হয়েছে কে জানে। সারা দেশের জঙ্গলেই তো এই অবস্থা। তার উপরে অনেক আদিবাসী এলাকাতে আদিবাসীরাও সরকারের উপরে রাগে এইভাবে অরণ্য ধ্বংস করেছে। পরে বুঝতে পারবে যে ঠিক করেনি। অরণ্যই যে তাদের মা, তাদের জীবনের সবচেয়ে বড় অবলম্বন, এ কথা যদি তারাই না বোঝে তো কারা বুঝবে বল।

—নামুন সাহেব-মেমসাহেব।

পোর্তে বলল।

ওরা গাড়ি থেকে নামলে কিছুটা হেঁটে একটা মহীরুহের কাছে নিয়ে গেল পোর্তে ওদের। গাছটার গুঁড়িটারও পরিধি এতো বড় যে ঝাঁজির মতো ভাল স্বাস্থ্য ও লম্বা চওড়া দশজন মানুষও হাতের ঘোরে সে গাছের কাণ্ড ঘিরতে পারবে না। আর গাছটা এতটাই লম্বা যে গাড়ির গুঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে তার মাথা দেখতে ঘাড়কে পুরোটা পেছনে নামিয়ে দেখতে হয়। গাছ তো নয়, যেন মনুমেন্ট।

পোর্তে বলল, মেভ্রিসেরাই মরে যাচ্ছে। ইনিই ছিলেন আমাদের সব বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করার দেবী। ইনি মরে গেলে কে আমাদের বাঁচাবে কে জানে!

ওরা দেখল যে, গাছের গুঁড়িতে প্রায় এক মানুষ সমান জায়গা সিঁদুর চর্চিত। তিনটে সিঁদুরমাখা ত্রিশূল পোঁতা আছে গুঁড়ির সামনে, প্রস্তরময় মাটিতে।

—কী ওগুলো?

ঝিনুক জিজ্ঞেস করল পোর্তেকে।

—ওই। গোন্দ আর বাইগা বস্তির মানুষেরা পুজো দিয়েছে নানা বিপদ থেকে বাঁচতে।

গুঁড়ির কাছে মেভ্রিসেরাই-এর ছাল পড়ে আছে এদিকে ওদিকে। গাছের ছাল, গাছ মরে যাচ্ছে বলেই খুলে খুলে পড়ছে। সেই শুকনো ছাল প্রায়

দু-আড়াই ইঞ্চি পুরু। তা থেকেই গাছটার চেহারার একটা অনুমান করতে পারছিল ওরা।

—কখনও দেখেছিস তুই এত বড় গাছ?

ঝাঁজি জিজ্ঞেস করল ঝিনুককে।

—শিবপুরের বটানিক্যাল গার্ডেনের বটগাছটা অনেক জায়গা নিয়ে আছে বটে, অনেকই ঝুরিটুরি নিয়ে কিন্তু সে গাছ তো এমন উঁচু নয়। তুইও কি দেখেছিস এমন গাছ কখনও আগে? শালগাছ? তুই তো অনেক জঙ্গলেই গেছিস তোর বড়মামার সঙ্গে।

—নারে। এত বড় গাছ আমি কখনওই দেখিনি আগে।

ওরা দু'জনে শাল গাছটার গুঁড়ির কাছে একটা কাটা শালগাছের গুঁড়ির উপরে বসল। যেটা কাটা হয়েছে সেটাও বড় কিন্তু সেই বড়ত্বের সঙ্গে মেভ্রিসেরাই-এর বড়ত্বের কোনও তুলনাই চলে না।

পোর্তে বলল, বহু বহু বছর আগে এক ঠিকাদার তার লোকজনদের পাঠিয়েছিল এই গাছ কাটার জন্য। তখনও এই গাছের প্রকৃত পরিচয় কেউই জানত না। ঠিকাদারের লোকেরা বিরাট বিরাট করাত নিয়ে এসে যখন মেভ্রিসেরাই-এর কাণ্ড কাটতে শুরু করল অমনি তার কাণ্ড থেকে মানুষের রক্তের মতো রক্ত বেরোতে লাগল। তা দেখে ঠিকাদারের লোকেরা ভয় পেয়ে গেল। সেদিনের মতো কাজ থামিয়ে তারা তাদের ঝুপড়িতে ফিরে গেল। রাতে তারা স্বপ্ন দেখল যে মেভ্রিসেরাই এক দেবীর রূপ ধরে এসে তাদের বলছেন : আমার কষ্ট হয়েছে। আমি এই অঞ্চলের সব গোন্দ বাইগাদের রক্ষয়িত্রী দেবী। তাদের মারী, অনাবৃষ্টি এবং অন্যান্য আপদ বিপদ থেকে আমিই রক্ষা করি। আমার ক্ষতি যারা করবে তাদের খুবই ক্ষতি হবে।

সে কথা না শুনে তাদের মালিকের কথা মতো করাতীরা পরদিন সকালে আবার করাত টরাত নিয়ে গাছ কাটা শুরু করল। আবারও গাছের গা দিয়ে মানুষের রক্তের মতো রক্ত বেরোতে শুরু করল। তখন তারা আবারও ভয় পেয়ে গাছ কাটা থামিয়ে ফিরে গেল। সেদিনই তারা এক দুরারোগ্য জ্বরে পড়ল এবং এক-এক করে অল্প দিনের মধ্যে সকলেই মারা গেল।

—লোভ বড় খারাপ রিপু। অত বড় সেরাই গাছটার দাম তখনকার দিনেই ছিল লক্ষাধিক টাকা।

—তখনকার দিনে মানে, কতদিন আগের ঘটনা এ?

ঝিনুক জিজ্ঞেস করল।

ঠিক বলতে পারব না মেমসাহেব, তবে আমার জন্মেরও আগের ঘটনা তো।

—তোমার বয়স কত?

—তা বলতে পারব না। তবে যে বছর এই অঞ্চলের জঙ্গলে জঙ্গলে সবচেয়ে বেশি ফুল ধরেছিল, সেরাই বনে হোলির সময়ে আর হোরিয়ালিতে সবচেয়ে জব্বর নাচা-গানা হয়েছিল স্মরণকালের মধ্যে, আমি সে বছর জন্মেছিলাম।

—বাঃ!

স্বগতোক্তি করল ঝিনুক।

ঝাঁজি বলল, আমাদের দেশের বন পাহাড়ের মানুষেরা তাদের বয়সের হিসেব জানে না। প্রাকৃতিক কোনও বিশেষ ঘটনা দিয়ে তাদের জন্ম-মৃত্যুর কথা মনে রাখে। যে বছরে চীচক রোগে অনেক মানুষ মারা গেছিল, যে বছরে মানুযখেকো বাঘের উপদ্রব বেড়েছিল, যে বছরে ভীষণ খরা হয়েছিল বা অতিবৃষ্টি, যে বছরে সবচেয়ে ভাল মহুল ফুল ফুটেছিল বা সবচেয়ে বেশি ফসল ফলেছিল সেই সব মনে করে রাখার ঘটনার সঙ্গে ওদের জন্মমৃত্যু বিনিসুতোর মালা দিয়ে গাঁথা।

—ভারি মজার ব্যাপার তো।

ঝিনুক বলল।

—তার পর কী হল? বলো পোর্তে।

—তার পর আর কী। লোভের মতো রিপু তো আর নেই। ঠিকাদার একদল নতুন করাতীকে নিয়ে এল। তারাও করাত লাগাতেই গাছের গা দিয়ে রক্ত বেরোতে লাগল। তারা কাজ থামিয়ে ঝুপড়িতে ফিরে গেল। তাদেরও স্বপ্ন দিলেন দেবী। সে রাতে সেই ঠিকাদার মুখে রক্ত উঠে মারা গেল। তারপর আর কেউ ও গাছ কাটার চেষ্টা করেনি, বনবিভাগও কারোকে বরাত দেয়নি। তখন থেকেই এ দিকের দশ-বারোটা গ্রামের সব মানুষ মেড্রিসেরাইকে দেবতাজ্ঞানে পুজো করে। এই তো আর ক'দিন বাদে হোরিয়ালির সময়ে কত পুজো পড়বে এখানে।

—হোরিয়ালি মানে কী? হোলি?

পোর্তে হেসে ফেলল ঝিনুকের কথা শুনে।

বলল, হোরিয়ালি হোলি হতে যাবে কেন? হোরিয়ালি হোরিয়ালিই।

—জিনিসটা কী?

ঝাঁজি বলল।

—পরব একটা আমাদের।

—তোমাদের মানে? কাদের?

—এই গোন্দ, বাইগা, পানকাদের।

—কী করো তোমরা হোরিয়ালিতে?

—আমরা জমির বুকে বীজ বপন করি। দেখছেন না বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। মাটি এবারে নরম হবে। হোরিয়ালিতে আমরা চাষাবাদের পত্তন করব এ বছরের মতো।

তারপরই বলল, আমরা আদিবাসীরা আগে চাষ করতাম না। জনসংখ্যার চাপে বাধ্য হয়ে করছি।

—ক'দিন হল করছ?

—এই দশ-কুড়ি বছর।

ঝাঁজি ভাবছিল, বেশ মানুষ এরা। ফুল আর কুঁড়ির মধ্যে যেন কোনো তফাত নেই।

—চাষ করতে না কেন?

—মাটি তো আমাদের মা। মায়ের গায়ে লাঙল চালানো কি উচিত? মায়ের কষ্ট হবে না?

ঝাঁজি বলল, 'সিজার প্লাওড ক্লিওপেট্রা'। এই লাঙল চালানো ব্যাপারটার মধ্যে একধরনের যৌনতা আছে। ভাবলেই গা শিরশির করে। তাই না রে?

—তোর তো সবেতেই গা শিরশির করে।

ঝিনুক বলল।

—পূর্ব আফ্রিকার মাসাই উপজাতিরাও চাষবাস করে না। মাটিকে মাতৃভাবে দেখে। ওরা অবশ্য যাযাবর। গরুমোষ চরিয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গাতে যায়। তবে ওদের গ্রামগুলো ভারি সুন্দর। তাদের নাম হল ক্রাল। গরুমোষের মাংস, দুধ আর রক্তই ওদের প্রধান খাদ্য পানীয়। জানিস তো? মাসাই ছেলেদের কোনও মাসাই মেয়ে বিয়ে করে না, পায়ে হেঁটে বল্লম দিয়ে যদি সে অন্তত একটা সিংহ শিকার করতে না পারে।

—খুব বেঁচে গেছিস তুই বল? মাসাই না হয়ে। হলে তো আর এত সহজে বিয়েটা করতে পারতিস না।

তারপর বলল, তুই এত সব জানলি কী করে?

—বই পড়ে আর কী করে। তা ছাড়া বড়মামা তো কিনিয়া তানজানিয়া সব জায়গাতেই গেছেন। তাঁর কাছে গল্প শুনেও জেনেছি অনেক কিছু। পৃথিবীর বৃহত্তম মৃত আগ্নেয়গিরি গোরোংগোরোর বলয়ের মধ্যে হ্রদ আছে, পাহাড় আছে, তৃণভূমি আছে, আর আঝে অগণ্য পশু-পাখি। সেরেঙ্গেটি প্লেইনস-এর কথাও পড়েছি। আর্নেস্ট হেসিংওয়ে এবং বব রুয়ার্ক-এর লেখাতে। চল আমরা একবার যাব পুব আফ্রিকাতে। ছেলেবেলাতে সেই বিভূতিভূষণের চাঁদের পাহাড় আর মরণের ডংকা বাজে পড়ার দিন থেকেই ইচ্ছে আছে একবার আফ্রিকাতে যাবার। জুন জুলাইতে যাব। তখনই ওখানে শীতকাল।

ঝিনুক বলল, এখনকার ছেলেমেয়েরা হ্যারি পটার পড়ে এই সব বই পড়ে না। আমরা যখন পরাধীন ছিলাম তখনও আমরা এতখানি ট্যাঁশ ছিলাম না। অথচ ইংরেজিও যে আমরা পড়তাম না তা তো নয়। বাঙালি জাতটার বড়ই অধঃপতন হয়ে গেল চোখের সামনে।

—আমার মনে হয় হাওয়া ঘুরবে। নিধুবাবুর সেই একটা গান আছে না? "নানান দেশে নানান ভাষা, বিনে স্বদেশী ভাষা পুরে কি আশা?"

—আছেই তো? দারুণ গান।

—পশ্চিম আফ্রিকার রুয়েঞ্জোরি রেঞ্জ-এ সত্যি সত্যিই The Mountain of the Moon বলে একটি তুষারাবৃত পর্বত আছে তা কি জানিস?

—সত্যি? জানতাম না তো।

—বড়মামার কাছে একটা বই আছে তাতে সেই পর্বতের ফোটো আছে। দেখলে গা ছমছম করে ওঠে।

—ভাবা যায় না, না? বিভূতিভূষণ তো আফ্রিকাতে যাননি।

—তেমন কোথায়ই বা গেছেন। অথচ তাঁর পড়াশোনা ছিল প্রচুর। তখনকার দিনেও তিনি লাইব্রেরিতে গিয়ে নিয়মিত ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটির জার্নাল পড়তেন। প্রবল কল্পনাশক্তি থাকলে তবেই ইছামতি নদীর পাশের বারাকপুরে লণ্ঠনের আলোতে বসে কোনও মানুষ 'চাঁদের পাহাড়' বা 'মরণের ডংকা বাজে' লিখতে পারেন। 'আরণ্যক' লেখাও সম্ভব হয়েছিল ওইরকম তীব্র কল্পনাশক্তির কারণেই, যদিও পূর্ণিয়াতে উনি গেছিলেন ঠিকই।

তারপরই বলল, জানিস তো ঝিনুক, সেদিন কলকাতাতে সানি টাওয়ার্স-এ উলহাস কাশালকার-এর পঞ্চাশ বছরের জন্মদিনে জয়ন্ত

চ্যাটার্জির ফ্ল্যাটে বাবু খেলাতচন্দ্র ঘোষের বংশধরের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আসলে উনি হোমরা- চোমরাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। আমি তাঁকে দেখেই উত্তেজিত হয়ে গেছিলাম।

—সত্যি? দারুণ একসাইটিং ব্যাপার তো! আমার তো ধারণা ছিল বিভূতিভূষণের ও ব্যাপারটাও কল্পনাপ্রসূত ছিল। তা নয়, তা হলে?

—নয়ই তো। নইলে তোকে বলছি কী?

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে ঝাঁজি বলল, দেখছিস, প্রায় এগারোটা বাজতে চলল। এখন আর বুড়া বাবা-টাবার কাছে যাওয়ার দরকার নেই।

—সেখানে যাওয়ার দরকার কি আদৌ আছে।

ঝিনুক বলল।

তারপর বলল, আমার কিন্তু এসব দেব-দ্বিজে একটুও ভক্তি-টক্তি নেই। তবে মা খুব ভক্তিমতী মহিলা। দিদিমা কাঠিয়াবাবার শিষ্যা ছিলেন। তবে আমি দুর্গাপুজো, কালীপুজো, লক্ষ্মীপুজো রিচুয়াল হিসেবে মানি। তা ছাড়া সরস্বতী পুজোও মানি।

—হ্যাঁ, মনে আছে। বাসন্তী রঙা শাড়ি পরে সরস্বতী পুজোর দিনে স্কুলে আসতিস তুই। সাদা ব্লাউজে, বাসন্তী রঙা শাড়িতে আর সদ্যস্নাতা পিঠময় এলিয়ে দেওয়া সুগন্ধি চুলে তোকে অচেনা অচেনা লাগত। মনে আছে? গান গাইতিস তুই স্কুলে সন্ধেবেলার অনুষ্ঠানে। গানটা কিন্তু তুই ভালই গাইতিস, ছেড়ে দিলি কেন রে?

—ছাড়িনি তো। চানঘরে এখনও গাই। পড়াশোনার চাপ এমনই বাড়ল, কোচিং ক্লাস—রাখা গেল না।

—রাখলে পারতিস।

—তুই যে আমাকে সেই মেয়েবেলা থেকেই অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করতিস তা আজকে বুঝতে পারছি।

ঝিনুক বলল।

—করব না? তোকে যে আমি বিয়ে করব তা তো ক্লাস ফোর-এ পড়ার সময় থেকেই ঠিক করে রেখেছিলাম।

—মহা পাকা ছেলে ছিলি তো তুই!

—যা বলেছিস। এই দেশে বুদ্ধিমানদেরই পাকা বলে।

—তাই?

—ফাজিল এক নম্বরের তুই।

বলে, হাসল ঝিনুক।

—ভক্তি-টক্তি আমারও নেই কিন্তু আমার আবার ঔৎসুক্য আছে। দেখিই না কী ব্যাপার, এইরকম একটা অ্যাটিটুড আর কী। "যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখো তাই মিলিলে মিলিতে পারে অমূল্য রতন।" বুঝলি না?

ঝাঁজি বলল।

ঝিনুক বলল, সেটা অবশ্য ঠিকই বলেছিস। ইনকুইজিটিভ হওয়া ভাল। তা নইলে কী গ্রহণযোগ্য আর কী বাতিলযোগ্য তাইতো বোঝা যাবে না, তাই না?

—ঠিক।

—চলো পোর্তে। তোমার বুড়হা বাবার কাছে বিকেলে আসব চা-টা খেয়ে। আখড়া অবধি গাড়ি যাবে তো?

—না সাহেব। সিকি মাইল মতো হাঁটতে হবে গভীর জঙ্গলের মধ্যে গাড়ি ছেড়ে দিয়ে।

—ভয় আছে কিছু? রাত হয়ে গেলে ফিরতে?

না, ভয় আর কী? বৃষ্টি পড়েছে তো। একটু সাপের ভয় আর ভাল্লুকের ভয়। বড়কা বড়কা দাঁতাল শুয়োরও আছে। একটা বড় ঝুণ্ড আছে বাবার আখড়ার জঙ্গলে। তবে অসুবিধে নেই। চাঁদ থাকবে তো। আমাদের সঙ্গে টর্চও থাকবে। তা ছাড়া বুড়া বাবার আখড়ার কাছে প্রতি মাসে দু'বস্তা করে নুন ছড়িয়ে দেন উনি। রাজ্যের জানোয়ার নুন চাটতে আসে।

—তা আসুক। ক্ষতি তো করবে না। তা ছাড়া। নুন তো খায় হার্বিভোরাস অ্যানিম্যালস।

—মানে সাহেব?

—ওঃ, মানে যারা তৃণভোজী জানোয়ার।

ঝিনুক বলল, তাদের বুঝি শিং নেই, ঢুঁসিয়ে দিলে?

—তোর যত বাজে ভাবনা।

—বিকেলের দিকে গেলে একটু বেশিক্ষণ বসা যাবে। তুমি তো বললে তোমার বুড়হা বাবা বাঙালি এবং খুবই পণ্ডিত মানুষ।

—আমি আর কতটুকু জানি সাহেব। অনেক পড়েলিখে বড় বড় সাহেব-মেমসাহেব আসেন তো তাঁর কাছে। তিনি নিজে তাদের চেয়েও পণ্ডিত না হলে তাঁরা আসবেনই বা কেন?

—তা তো ঠিকই।

তারপর ঝিনুক বলল, হোরিয়ালিতে তোমরা কী কী ফসল বোনো? ধান বোনো? ডাল?

—বুনি তো। তবে এখানে ধান থেকে যে চাল হয় তাদের নাম ঝিল্লি, সফরি, দুবরাজ। সাধারণ চালের নাম লোচাই। একেবারে জংলি ধানও হয় নানারকম।

—কেমন?

—সাঁওয়া, গোল্‌দনি, চিনামিনা।

—ধান ছাড়া আর কী বোনো?

—জওয়ার, মকাই, গেঁহু। রাই মানে আপনাদের সর্ষে, তিল্লি মানে তিল। আরেক রকমের তেল বানাই অমরা তার নাম জাগনি। শুনেছি এদের নাকি অন্য জায়গাতে বলে সরগুজা।

—ডাল বোনো না তোমরা কোনওরকম?

—বললাম যে আগে। করি, ডালও করি।

—কী ডাল করো?

—কূটবি, কোদো।

—আমরা তো মসুর ছোলা মুগ এসব নাম জানি। এগুলো আবার কী নাম?

—ওই। আমরা ওই সবই জানি। আমাদের এখানে এরকম ডাল হয় আপনাদের মটর ডালের মতো দেখতে। তার নাম তেওড়া। কড়াইতে একটু তেল দিয়ে ছাড়লেই তিড়িং বিড়িং করে লাফাতে থাকে।

ঝিনুক বলল, 'তেওড়া' তালে লাফায় নাকি?

রসিকতাটা ঘাসীরাম পোর্তে বুঝতে পারল না।

ঝাঁজি বলল, এবারে চলো গাড়ির দিকে। ফেরা যাক।

তারপরই বলল, ওই দ্যাখ। তুই তো দেখতে পারবি না, আমি দেখতে পাচ্ছি।

—কী?

—মেঘছেঁড়া আলো এসে পড়েছিল কালো কেশে...

ঝিনুক চমকে উঠে বলল, তুই কি জানিস গানটা?

ঝাঁজি হাসল, ধরা পড়া হাসি।

—তুই বুঝি তোর ছেলে বন্ধুদের সামনেই গান গাইতিস?

—আজকাল আবার ছেলে-বন্ধু মেয়েবন্ধু আছে নাকি? সে সব তো কবেই তামাদি হয়ে গেছে। বন্ধু মানে বন্ধুই। সেক্স-বায়াস এখন কোনও শিক্ষিত মানুষেরই নেই।

—তা না থাকতে পারে তবে শরীরে মনে ঈশ্বর তো নারী ও পুরুষকে আলাদা করেই গড়েছেন। কিছু বেসিক তফাত তো আছেই। শারীরিক গড়নে তো আছেই, মানসিক গড়নেও আছে। সেটা তো অস্বীকার করা যায় না।

—তোর গানের কথা হচ্ছিল। কথা ঘুরিয়ে দিলি তুই।

—আরে আমি যে গান গাই তা কারোকে শোনাবার মতো নয়। ছেলেবেলাতে মা অর্গান বাজিয়ে ব্রহ্মসঙ্গীত আর নানা রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতেন। মায়ের সঙ্গে গুনগুন করে গাইতাম। মায়ের গান আমি শুনতাম, আমার গান মা শুনতেন।

—মেসোমশাই?

—না বাবা ছিলেন বইয়ের পোকা। গান তো গাইতেন না, শুনতেও বিশেষ ভালবাসতেন না।

—গান ভাল না বাসা তো সুস্থ মানসিকতার লক্ষণ নয়। আর তোর অরণ্যচারী বড়মামা?

—বড়মামার কথা আলাদা। গান শুধু ভালবাসতেন না, নিজে খুব ভাল গাইতেনও। নানা বন-বাংলোর বারান্দায় শীতে গ্রীষ্মে অথবা বর্ষাকালে বড়মামার উদাত্ত গলার গান এখনও কানে ভাসে। এইরকম পরস্পরবিরোধী গুণসম্পন্ন একজন মানুষ আমি আর দেখিনি। আর সেই মানুষকেই তোদের ঈশ্বর যে কেন বাকরুদ্ধ করে শুইয়ে রাখলেন, কে জানে! আজ দেড় বছর হয়ে গেল সেরিব্রাল স্ট্রোকে অমন শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে রয়েছেন। মাঝে মাঝে মনে হয় নিজে হাতে গুলি করে মেরে দিই বড়মামাকে।

ঝিনুক কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। ততক্ষণে ওরা গাড়ি অবধি পৌঁছে গিয়েছে। পোর্তে দরজা খুলে দিতে গাড়িতে উঠল ওরা দু'জন।

গাড়ি স্টার্ট করার পরে ঝাঁজি বলল, ইফ উ্য হ্যাভ আ সোফার ড্রিভন কার ইওর প্রাইভেসি ইজ টোটালি ডিসটার্বড। তাই না?

—তা তো নিশ্চয়ই। কিন্তু অচেনা রাজ্যের এই বন-পাহাড়ে কীইবা করা যাবে?

—তা অবশ্য ঠিক।

তারপর বলল, বাংলোতে ফিরে তুই গানটা আমাকে শোনাবি কিন্তু। সত্যি! তোর বেরসিক ছেলেবন্ধুগুলোর কেউই তো বলেনি আমাকে না যে তুই গান জানিস।

ঝাঁজি বলল, বলবে কী? ঈর্ষা, ঈর্ষা, শিয়োর জেলাসি। তোর উপরে বিটু, অনীক এবং সতুর লোভ ছিল না?

—ছিল বুঝি? কই আমি তো বুঝতে পারিনি।

—আমিই যে তোর দু'চোখ ভরে ছিলাম। ওদের তুই দেখবি কী করে?

—তাই?

বলে মৃদু হাসল ঝিনুক। বলল, চলো পোর্তে। বাড়াও তোমার গাড়ি।●



রান্না হতে এখনও অনেক দেরি আছে। একটু জিন খাবি না কি রে বউ?

—আমার ও সব ভালো লাগে না।

—রোজ কি আর খাবি? না কি আমিই খাই? হানিমুনে এসে মানুষে কত কী প্রথমবার করে। আমি কি তোকেই খেয়েছি কখনও আগে। কী রে বউ?

তারপর ঝাঁজি বলল, আজ থেকে তোকে বউ বলেই ডাকব। বুঝলি।

—তোকেও তা হলে আমি বর বলে ডাকব।

—বেশ তাই ডাকিস। দাঁড়া ঘর থেকে নিয়ে আসি জিনের বোতলটা আর দুটো গ্লাস দিতে বলে আসি, আর জল। কাগজীলেবু হয়তো পাওয়া যাবে। গন্ধরাজও পাওয়া যেতে পারে। পোর্তেকে বলে আসছি। সে স্মার্ট আছে। সব গুছিয়ে নিয়ে আসবে ট্রেতে বসিয়ে। তবে বরফ তো এখানে পাওয়া যাবে না। জমে যাবে বুঝলি বউ। আবার বৃষ্টি নামবে মনে হচ্ছে। দুপুরে খাওয়ার পরে তোকে আবার আদর করব। তুই যে কী সুন্দর তা কি তুই জানিস?

—আমার কী এমন আছে যা অন্য মেয়ের নেই?

—তী কী করে বলব। আমি তো অন্য কারোকেই এমন নিরাবরণ নিরাভরণ দেখিনি। তোকে দেখব, না তোকে খাব বুঝে উঠতে পারি না। আমাদের পাড়ার হাপুদার ছেলেটা যখন ছোট ছিল তখন মা একদিন ওকে এক থালা মিষ্টি দিয়ে বলেছিলেন, কোনটা খাবি বল রে পিলু? পিলু

অনেকক্ষণ একদৃষ্টে থালাটার দিকে চেয়ে থেকে বলেছিল, এতা খাবো, ওতা খাব, থব খাব।

ঝিনুক হিহি করে হেসে উঠল। বলল, তাই?

—তাই।

বলল, ঝাঁজি।

তারপর বলল, তুই যখন আঙ্গাপাঙ্গা হয়ে খাটের উপরে শুয়ে থাকিস তখন আমার পিলুরই মতো বলতে ইচ্ছে করে এতা খাব, ওতা খাব, থব খাব।

—ফাজিল।

হাসতে হাসতে বলল ঝিনুক।

তারপর বলল, তুইও সুন্দর। খুবই সুন্দর। আমিও তো কোনও পুরুষকে নিরাবরণ নিরাভরণ দেখিনি কখনও।

—পুরুয আবার সুন্দর হয় নাকি। মানুষের মধ্যে নারীরাই সুন্দর আর প্রাণীজগতে পুরুষ। সিংহ থেকে ময়ূর সব পুরষই সিংহী থেকে ময়ূরীর চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর।

—পুরুষের সৌন্দর্য নারীর চোখই বোঝে, জানে। তুই নিজেকে দেখবি কী করে?

—কী সুন্দর কথা বলিস রে তুই বউ। একটা বিয়ে করেছিলাম বটে। রূপে ডানাকাটা পরী, গুণেও তুলনাহীনা।

—যা, ইয়ার্কি না মেরে কী আনতে যাবি তা আন গিয়ে। ফিরে এসে কিন্তু সেই গানটা শোনাতে হবে। এ আমার উপরি পাওনা।

—উপরি মানে তো ঘুষ। তোকে ঘুষ দিয়ে আমি কিছুই পেতে চাই না।

—আরম্ভ হল আবার। যা এবার।

তারপর বলল, জানিস বর। তুই আমার আগে মরে যাস না। তা হলে আমি আর বাঁচব না।

—তুইও আমার আগে মরিস না। তা হলে আমি আত্মহত্যা করব।

—সব নববিবাহিত দম্পতিই বোধহয় এইরকমই বলে। তারপর যত দিন যায়, কত মতবিরোধ, মন-কষাকষি ঝগড়াঝাঁটি এমনকী, মারামারি পর্যন্ত গড়ায়। ছাড়াছাড়িও তো হয়ে যায় কতজনের। হয় না?

—না না, এই সুখের সময়ে ওসব অকথা-কুকথা মুখেও আনিস না। এখন

শুধুই আনন্দ কর, আনন্দের কথা বল, আনন্দের গান গা। জীবনে এই সময় কি আর কখনও ফিরে আসবে?

—তুই যা এবারে। বেলা বাড়ছে।

—'আমার বেলা যে যায় সাঁঝবেলাতে, তোমার সুরে সুরে সুর মেলাতে, আমার বেলা যে যায়', গাইতে গাইতে ঝাঁজি চলে গেল বাংলোর ভিতরে।

বনের মধ্যে নানা পাখি ডাকছিল। ঝুরুঝুরু করে হাওয়া দিচ্ছিল একটা বনমর্মর তুলে। ঝিনুক ভাবছিল তার শরীরের মধ্যে যে এত ও এতরকম তীব্র আনন্দ লুকিয়ে ছিল তা কি ও আগে জানত। ও যেন এক সাতমহলা বাড়ি। যে বাড়ি এতদিন অন্ধকার ছিল। ঝাড়লণ্ঠনের সুইচগুলি যে কোথায় লুকোনো ছিল তার কোনও খবরই তো ঝিনুক রাখেনি। এই দু'দিনেই ঝাঁজি তার শরীরের আনাচে কানাচের কত না লুকোনো সুইচে হাত দিয়ে তার সাতমহলা বাড়িকে আলোয় আলোয় ঝলমলে করে তুলেছে। ঝাঁজি যখন তার শরীরের কেন্দ্রবিন্দুতে তার শরীরের সব অলিগলিতে আকুলিবিকুলি করে তখন শরীরটা যেন আনন্দে কেঁদে ওঠে। এত আনন্দ সে কোথায় রাখবে ভেবে পায় না। তার শরীরের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন বাঙ্ময় হয়ে ওঠে, শতমুখে কথা কয়। বিয়ে না হলে কি সে কোনও দিনও জানতে পেত এই সব রহস্য, এই সব গভীর এবং তীব্র আনন্দের কথা! নারীবাদীরা যাই বলুন, একজন পুরুষ নইলে একজন নারী যে সম্পূর্ণ হয় না এই পরম সত্য কথাটা সে আগে বোঝেনি। ঈশ্বর, নারী আর পুরুষকে একে অন্যের পরিপূরক করে গড়েছেন। একে নইলে অন্যে অপূর্ণ, অতৃপ্তই থেকে যেত। নারী কখনওই পুরুষের প্রতিযোগী নয়, জিনস আর টপ পরলেই নারী পুরুষের সমান হয়ে যায় না বোধহয়। এটা ওর নিজের বোধ। সব নারী ওর কথা না মানতেও পারে। কিন্তু ও তো নিজের কথাই বোঝে, জানে। অন্যকে জানাবার বা বোঝাবার ওর দরকারই বা কী?

ভাবছিল ঝিনুক যে ঝাঁজি যখন ওকে শাড়িতেই সুন্দরী দেখে তখন শাড়িই পরবে। এই বাঙালিয়ানা ওর অপছন্দেরও নয়। শাড়ি পরলে যদি কাজের অসুবিধেই হবে তো গ্রামবাংলার কোটি কোটি মেয়েরা বাড়িতে, মাঠে, বনে-জঙ্গলে শাড়ি পরে এত ও এতরকম কাজ করে কী করে। পোশাকের এই সব বৈচিত্র্য, চাকচিক্য সম্ভবত সচ্ছল মেয়েদেরই

একচেটিয়া। পশ্চিমী দুনিয়ার প্রচণ্ড প্রভাব পড়েছে এখন সচ্ছল শহরবাসীর উপরে তাই বাঙালিয়ানাকে তারা ত্যাগ করেছে। সালোয়ার কামিজও তো বাঙালি মেয়েদের পোশাক ছিল না কখনও। ইদানীং হয়েছে। সালোয়ার-কামিজ না পরে বা জিনস না পরে না কি কাজই করা সম্ভব নয়। ইন্দিরা গান্ধীও তো কখনও সালোয়ার কামিজ পরেননি অথচ তিনি তো অধিকাংশই ভারতীয় মহিলার চেয়েও অনেক বেশি কাজ করেছেন। ঝাঁজি যদি তাকে শাড়িতেই সুন্দরী দেখে তা হলে সে শুধু শাড়িই পরবে এবার থেকে।

ঝাঁজি জিনের বোতলটা নিয়ে ফিরে এল। রাখল টেবল-এর উপরে।

—কী জিন রে এটা?

—বীফইটার জিন। ইংলিশ। একটা সিভাস রিগ্যাল হুইস্কিও এনেছি। রাতে তোকে আদর করার আগে দুটো খাব, তোকেও খাওয়াব।

—কী হয় হুইস্কি খেলে?

—বড়মামা বলেন, খুশি খুশি লাগে। মনের ভার কেটে যায়। ইনট্রোস্পেকশন এবং কনটেমপ্লেশনের সুবিধা হয়। নইলে অধিকাংশ কবি-সাহিত্যিক গায়ক-বাদকই এ সব খান কেন? তা বলে কনভার্স ইজ নট ট্রু। এ সব খেলেই যে কেউ কবি-সাহিত্যিক গায়ক-বাদক হয়ে উঠবে এমন মনে করার কোনওও কারণ নেই। অমন কারণ দেখান কিছু নির্গুণ মানুষ। গুণীদের অনুকরণ করলেই যদি গুণী হওয়া যেত তা হলে আর দুঃখ ছিল কি?

পোর্তেই সব গুছিয়ে নিয়ে এল। বিলাসপুর থেকে লেবুও দিয়ে দিয়েছেন সুভাষমামা। কত খুঁটিনাটি নিয়েও যে ভেবেছেন সুভাষমামা। কিছু মানুষ থাকেন এরকমই যত্নবান। যা কিছুই করেন তা নিখুঁতভাবে করেন। এমনি এমনিই কী জীবনে উন্নতি করে মানুষ।

ভাবছিল ঝিনুক।

ঝাঁজি পোর্তেকে বলল, তুমি যাও, দ্যাখো রান্নার কত দূর হল। আমরা দেড়টা নাগাদ খাব।

পোর্তে চলে গেলে ঝিনুক বলল, বাঁচা গেল। লোকটার সব ভাল, শুধু ঘাড়ের উপর নিঃশ্বাস ফেলে এই দোষ। আমাদের হানিমুনকে সাওয়ারমুন করে দিচ্ছে লোকটা।

ঝাঁজি হেসে বলে, ও না থাকলে আমাদের কত অসুবিধা হত তা ভাব। ড্রাইভারের কাজ তো এ সব নয়। মেন্ড্রিসেরাই দেখিয়ে আনল, বিকেলে বুড়া বাবা দেখাবে। এ সব খিদমতগারি করছে তো একটু বেশি বখশিস পাবার জন্যেই। কতইবা মাইনে পায়? বউ আছে, ছেলে আছে। জমিজমা যদি থাকেও, সে আর কতটুকু।

—ওকে মোটা বখশিস দিয়ে দেব আমি।

—তুই কেন দিবি? তুই তো আমার বউ। হানিমুনের সব খরচ বরেরই।

—বেশি মেল শভিনিজম দেখাস না।

—এই তো তোদের দোষ। একটু মেনেই নে না। সারাজীবন তো পড়ে রয়েছে নারীত্ব প্রমাণ করার জন্যে। এখানে আমার সব কথা-শোনা, আদর-খাওয়া লক্ষ্মী-বউ হয়েই না হয় কাটালি কটা দিন।

—ঠিক আছে। আমি একটা শাড়ি দিয়ে দেব পোর্তের বউকে।

—বাঃ। তবে, অনেক কটা শাড়িই তো এনেছি। জিনস আনলে একটা জিনসেই চলে যেত। তুই আবার আমাকে শাড়িতেই সুন্দরী দেখিস। আসলে সুন্দরী তো নই। শাড়ি যদি সৌন্দর্য ধার দিতে পারে তা হলে মন্দ কী?

ঝাঁজি ওর কথার জবাব না দিয়ে মনোযোগ সহকারে জিনটা সাজাতে লাগল।

—আমাকে অল্প একটু দিবি। এ সব আমার একেবারেই ভাল লাগে না। দু'একবার বিয়ারের সঙ্গে লেমনেড মিশিয়ে শ্যান্ডি খেয়েছি। স্কুলের শিক্ষিকাদের অনেক সংযম করে থাকতে হয়। মেয়েদের চরিত্রগঠনের কাজ যাদের, যারা মানুষ গড়ার কারিগর, তাদের অন্য দশজনের মতো হলে চলবেই বা কেন? তা ছাড়া মা জানতে পারলে এমন দুম-পিট্টি দেবে যে বলার নয়।

—ছাড় তো। বিয়ে যেন রোজ করছিস আর হানিমুনেও যেন রোজ আসছিস। হানিমুনে এসে সব কিছুই করা যায়। মাসিমা কিছুই মনে করবেন না। মাসিরও কি একদিন তোর মতো বয়স ছিল না, না মাসিমাও কি হানিমুনে যাননি?

—মা হানিমুনে যাননি। তবে বিয়ের দিন সাতেক পরে বাবার সঙ্গে হাজারিবাগে গেছিলেন। সেই গল্প করতে বসলে এখনও মা ইমোশনাল হয়ে পড়েন। লাল মাটি, শালবন, কানহারী আর সিলওয়ার আর শীতাগড়া

পাহাড়— টাটিঝারিয়া, টুটিলাওয়া, সিমারিয়া, বগোদর, বরহি, ঝুমরি, তিলাইয়া, ইউক্যালিপটাস গাছের সারি, অখিল মামাদের বাড়ির বাগানের ম্যাগনোলিয়া গ্র্যান্ডিফ্লোরা, টিটি পাখি, তিতির, বটের, বনমুরগী, বনময়ূর, বনটিয়া, নীলকণ্ঠ পাখি।

মা আর বাবা অখিল মামার বাড়িতে গিয়ে উঠেছিলেন। ঝাঁজি বলল, চল আমরা একবার হাজারিবাগে যাব মাসিমাকে নিয়ে। তোর অখিল মামার বাড়ি কি এখনও আছে?

—অখিলমামা চলে গেছেন, কিন্তু বাড়ি আছে। তবে সে বাড়ি কোন ভাইয়ের ভাগে পড়েছে তা মা জানেন না। তেমন সুন্দর বাগান আছে কি না তাও নয়। খুব বেশি বড়লোক হলে এই ঘটে।

—কী ঘটে?

—না, বাবার ডেডবডি দাহ হতে না হতে সম্পত্তি নিয়ে কোঁদল শুরু হয়ে যায়। অখিলমামা নাকি দাদাদের সঙ্গে ওই সম্পত্তির বিবাদের টেনশনে টেনশনেই অকালে চলে গেলেন।

—তোর কী রকম মামা হন অখিলমামা?

—আপন মামা নন। আত্মীয়ও নন। আসলে অখিলমামা তোর বড়মামারই বন্ধু ছিলেন। শিকারের বন্ধু। ওঁরা শুনেছি তিন ভাই ছিলেন। নিখিল আর অনিল। আর অখিল।

—তা ঠিক। বড়মামা প্রায়ই বলতেন, বিনাশ্রমে অর্জিত ধন মানুষকে অমানুষ করে দেয়। সেই সব ধনীরা ধনের ব্যবহারও শেখেন না। ঈশ্বর কারো কারোকে চওড়া কাঁধ দিয়ে পাঠান দশজনের বোঝা বইবার জন্যে। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যারা অন্যের বোঝা না বয়, খয়রাত জিরাত না করে, তাদের জায়গা হয় দোজখ্-এ।

—তোর বড় মামা এই সব শব্দ ব্যবহার করতেন না কি?

—কোন সব শব্দ?

ওই খয়রাত, জিরাত, দোজখ্...

—হ্যাঁ। করতেন। বড়মামার অনেক বিহারী উত্তরপ্রদেশীয় মুসলমান শিকারী বন্ধুবান্ধব ছিলেন। উর্দু ভাল বলতে পারতেন। গজর আর শায়রীর, আতরের আর বিরিয়ানির খুব ভক্ত ছিলেন। বড়মামার মতো 'জিন্দাদিল' মানুষ খুব কমই দেখেছি। অত বড় ব্যারিস্টার ছিলেন কিন্তু এতটুকু দেমাক

ছিল না। কথাতে বলে 'নরানাং মাতুলক্রম', কিন্তু আমি একটা কুলাঙ্গার হয়েছি।

—তুই যে তোর বড়মামার জীবনদর্শন পেয়েছিস এটাই বা কম কথা কী? ব্যারিস্টার নাইবা হলি, গজল নাইবা গাইলি, এইটাও তো একটা বড় উত্তরাধিকার।

ঝাঁজি হেসে বলল, তবে বড়মামার আতরের ঐতিহ্যটা আমি রেখেছি। উত্তর বা পশ্চিম ভারতে গেলেই আতর জোগাড় করে আনি। সঙ্গে করে এনেওছি। কাল রাতে বৃষ্টি পড়ে বিছানা ভিজে গেল, সুবিধে হয়নি। আজ থেকে দুপুরে ও রাতে তোকে আতর মাখাব।

—কী আতর এনেছিস?

—খসস্ আর ফিরদৌস। বিরিয়ানি যেমন রান্না একটা আর্ট, বিরিয়ানি পরিবেশন করাটাও একটা আর্ট, ওরা বলেন, 'হান্ডি নিকালনা'। তেমনই আতর লাগানোও একটা আর্ট। আদর করার আগে তোর সুন্দর শরীরের কোথায় কোথায় কোন পাহাড়ে কন্দরে কী করে আতর লাগাতে হয় তা যখন লাগাব তখনই জানবি।

—চুপ কর তো। তুই ভীষণই অসভ্য। সেই মেয়েবেলা থেকে তোকে দেখে আসছি কখনওই বুঝতে পারিনি যে তুই এত অসভ্য।

হাসতে হাসতে ঝাঁজি বলল, মেয়েরা আসলে অসভ্য ছেলেদেরই বেশি পছন্দ করে।

—ঈস্স রে—মেয়েদের উপরে অথরিটি এসেছেন। কখনও জেনারালাইজ করবি না। আমরা মেয়েরা কি গরু ছাগল? প্রত্যেক মেয়েই আলাদা আলাদা। আলাদা আমাদের শারীরিকতা, আলাদা মানসিকতা। আমরা কেউই অন্য কারও মতো নই।

—তা হবে। অজ্ঞতা স্বীকার করে নিয়ে বলল, ঝাঁজি।

তারপর বলল, আমি তো এই একজনকেই জানলাম। তাও না ক'দিন হল জেনেছি। এটুকু জেনেই মনে হচ্ছে পণ্ডিত হয়ে গেছি।

বলেই জিন-এর গ্লাস তুলে নিয়ে বলল, চিয়ার্স। নে বউ, খা।

—চিয়ার্স।

—আমাদের বিবাহিত জীবনের প্রত্যেকটা দিন রাতই যেন এই কটা দিন রাতের মতো সুন্দর হয়।

ঝিনুক বলল।

—এটা কী বললি বউ! প্রতি রাতেই কি ফুটো ছাদ দিয়ে জল পড়বে!

হেসে ফেলল ঝিনুক। বলল, তোকে সেই কবে থেকে জানি, ভেবেছিলাম তোকে পুরোপুরিই জেনে ফেলেছি। এখন দেখছি, তোকে কিছুই জানিনি। তুই যে এমন ফাজিল তা জানতাম না।

—ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যেন আমাকে তুই কখনওই পুরোপুরি না জানিস। আমিও যেন তোকে পুরোপুরি কখনওই না জানতে পারি। সবই জেনে ফেললে জীবনের কোনও রহস্য থাকে না। মুর্শিদাবাদের মুসলমান কারিগরেরা মুর্শিদাবাদী সিল্কের বালাপোষ যেমন পরতের পর পরত আতরমাখা তুলো দিয়ে বানায়, আমাদের জীবনও যেন সেই সব ময়ূরপঙ্খি-রঙা বালাপোষেরই মতো হয়। পরতে পরতে সুগন্ধ, পরতে পরতে রহস্য যেন মাখা থাকে তাতে। আমাদের জীবন যেন কখনওই মানডেন, একঘেয়ে না হয়ে যায়।

—বাঃ! ভারি সুন্দর করে বললি তো! কথাও তো ভারি সুন্দর বলতে পারিস তুই রে আমার বর।

—শুধু কথাই নয়, কাজও খুব সুন্দর করে করতে পারি। আজ দুপুরেই তার প্রমাণ পাবি। আর আগমী কাল ইতালিয়ান অলিভ অয়েল দিয়ে তোকে যখন আপাদমস্তক মালিশ করে দেব তোকে আতর দেওয়া জলে চান করাবার সময়, তখনও দেখবি আমি ছবি না এঁকেও কত বড় আর্টিস্ট।

লজ্জাতে মুখটা লাল হয়ে গেল ঝিনুকের। বলল, গানটা এবারে শোনাবি?

—কোন গান?

—সেই যে মেড্রিসেরাই থেকে ফেরার সময়ে যে গানটা শুরু করেই থামিয়ে দিলি।

—গাইতেই হবে।

—হ্যাঁ। গাইতেই হবে।

—গাইছি তবে। সুর কিন্তু ভুলভাল হবে। সেই কবে শিখেছিলাম মায়ের মুখে শুনে। সে কী আজকের কথা!

—গা। আর কথা নয়।

ঝাঁজি ধরল গানটা :

"কিছু বলব বলে এসেছিলেম,
রইনু চেয়ে না বলে।
দেখিলাম খোলা বাতায়নে মালা গাঁথো আপন মনে,
গাও গুনগুন গুঞ্জরিয়া যূথীকুঁড়ি নিয়ে কোলে।।
সারা আকাশ তোমার দিকে
চেয়ে ছিল অনিমিখে।
মেঘ-ছেঁড়া আলো এসে পড়েছিল কালো কেশে,
বাদল মেঘে মৃদুল হাওয়ায় অলক দেলে।"

—বাঃ। ঝিনুক বলল, এই আরণ্যক সকাল বেলায় আমাদের মধুচন্দ্রিমাতে এই গানটি যা গাইলি যতদিন বাঁচি ততদিন মনে গেঁথে থাকবে। সত্যি! রবীন্দ্রনাথ না থাকলে আমাদের জীবনটা যে কতখানি শূন্য হত। এই গান মাসিমা গেয়েছেন, হয়তো তোর দিদিমাও গেয়েছেন তাঁদের সময়ে, আবার তুইও আজ গাইলি অথচ মনে হল তোর আগে এ গান আর কেউই গায়নি। এ এক পরম আশ্চর্যের কথা যে একটি রবীন্দ্রসঙ্গীতও পুরনো হয় না। সব গানই যেন চিরনতুন। তবে এখন হাজারমানুষে, কী পুরুষ, কী নারী, রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্যাসেট আর সিডি বের করছেন। কিন্তু সে সব গান মনে যেন একটুও দাগ কাটে না।

—কাটবে কী করে বল? রবীন্দ্রনাথ বলতেন, যা কিছু হৃদয়ের যত গভীর থেকে ওঠে তা তত গভীরে গিয়ে পৌঁছয়। সে লেখাই হোক, কী গান।

—তা ঠিক।



দুপুরে গণা গোন্দ ভারি ভাল রান্না করেছিল। খাওয়া দাওয়ার পরে ওরা দু'জনে ঘরে দুয়ার দিয়ে শুল। তারপর যা যা বলেছিল ঝাঁজি ঝিনুককে ঠিক তাই তাই-ই করল।

ঝাঁজি কেবল বলতে লাগল তুই কী সুন্দর রে ঝিনুক।

ঝিনুক ওর ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলল, তুই বড় বাচাল। সবসময়ে কথা ভাল লাগে না। এখন আমার শরীর তোর শরীরের সঙ্গে কথা বলছে, এখন ছেঁদো কথা বলে এই গভীর আনন্দকে মাটি করিস না।

ঠিক বলেছিস বউ। আর কথা নয়।

বাইরে ফিসফিস করে বৃষ্টিপড়া শুরু হয়েছিল খাওয়ার সময় থেকেই। বৃষ্টির ফিসফিসানির সঙ্গে রঙ্গনের ঝোপ থেকে কিসকিস করে মৌটুসি ডাকছিল, বটল-ব্রাশ গাছের ডালের আড়াল থেকে সিপাহী বুলবুল।

ঝিনুকের অনাঘ্রাতা অনভিজ্ঞ শরীর তীব্র সব আনন্দে শিউরে শিউরে উঠছিল। শরীর যে তেমন ভাললাগার তীব্রতাতে অবুঝের মতো কান্নাকাটি করে ওঠে এ কথা জানা ছিল না। ঝাঁজিরও জানা ছিল না। অনেকক্ষণ পরে দু'জনেই পরম পুলকে থরথর করে কেঁপে উঠল। ঠিক সেই সময়ে ঝাঁজি হেসে উঠে বলল, যাঃ, নাটুটাকে ক্ষমা করে দিলাম।

—কে নাটু?

—নাটু আমার অফিসের এক কলিগ। শালা আমার কুড়ি হাজার টাকা

মেরে দিল। ফোর-টোয়েন্টি একটা। ধার বলে নিয়েছিল মিথ্যে প্রয়োজনের কথা বলে। মাঝে মাঝেই ওকে আমার চূড়ান্ত অপমান করতে ইচ্ছে হয়েছে, এমনকী মারতেও ইচ্ছে করেছে। কিন্তু আজ আমি এত সুখী, এমন তীব্র আনন্দের ভাগীদার করলি তুই বউ আমাকে যে নাটুকে আমি ক্ষমা করে দিলাম। আর কারো সাধ্য নেই আমাকে কোনও দুঃখ দেয়। এত সুখের মধ্যে ওই ছোটখাটো দুঃখ, অন্য মানুষের বঞ্চনা আমি মনে রাখতে চাই না। আর চাইব না ওর কাছে আমি টাকাটা। অন্যকে বঞ্চিত করে ও সুখী হোক, আমার আনন্দের গভীরতার সুখ ও কী করে বুঝবে। টাকাটা আমি ওকে দানই করে দেব।

ঝাঁজির বুকে মাথা দিয়ে শুয়ে ফিক করে হেসে ফেলল ঝিনুক। ডান হাতের আঙুলগুলি দিয়ে ওর মাথার চুল এলোমেলো করে দিয়ে বলল, তুই একটা পাগল।

আদর করার পরে, দু'জনে দু'জনের মধ্যে পরিস্রুত হবার পরে দুজনেই আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। এমন সুন্দর শারীরিক ক্লান্তির কথা ওদের দু'জনের কেউই আগে জানত না। ওরা খেয়ে দেয়ে ঘরে গিয়ে শুতে শুতে প্রায় আড়াইটে বেজে গিয়েছিল। স্কাইলাইটের আলোতে তখনই ঘরটা আধো-অন্ধকার ছিল।

কে যেন দরজাতে আলতো করে টোকা দিল বার দু-তিন। তাতেই ঘুম ভেঙে গেল ওদের। সম্পূর্ণ অনাবৃত থাকায় ওই মেঘলা এবং বৃষ্টিঝরা দিনে গা শিরশির করছিল ওদের তাই কখন যে বেড কভারটা টেনে নিয়ে তার নীচে চলে গিয়েছিল ওরা তা নিজেরাই জানে না।

চোখ মেলে দেখল ঘর অন্ধকার। স্কাইলাইট থেকেও আলো আর আসছে না। আলোর অস্পষ্ট আভাস আছে শুধু।

—কওন?

যেন ঘোরের মধ্যেই বলল ঝাঁজি।

—ম্যায় ঘাসীরাম সাহাব। চায়ে পিজিয়েগা ক্যা? আভভি সাম হো যায়েগা। বুড়া-বাবাকি পাস যানা নেহি হ্যায়?

ঝাঁজি বলল, চায়ে লাগানে বোলো। হমলোগোনে আ রহা হ্যায়।

ততক্ষণ ঝিনুকও চোখ খুলেছে। চোখ খুলে, স্থান ও কাল সম্বন্ধে হুঁস ফিরে আসতে বিছানাতে উঠে বসল। বসেই বেড কভার দিয়ে বুক ঢাকল। বর তো নতুন। যে লজ্জাকে, শালীনতাকে কিশোরী বয়স থেকে এক জোড়া

দুধলি হাঁসের মতো অনেক যতনে লালন পালন করেছে তাদের নিঃসঙ্কোচে অনাবৃত্ত করতে আরও অনেক সময় নেবে। বর পুরনো হয়ে গেলে হয় তো এত লজ্জা থাকবে না। কিন্তু এখনও তো সে প্রায় অচেনা পুরুষই।

ঝাঁজি বলল, ঝিনুক বাথরুমে গিয়ে চোখে মুখে জল দিয়ে এসে জামাকাপড় পরে নে। তারপর চা খেয়ে চল বুড়াবাবার আখড়াতে ঘুরে আসি।

যেতে কি হবেই? না গেলে হয় না?

একটা কিছু তো করতে হবে। নইলে সময় কাটবে কী করে!

—কেন ওই বাইরের বসার জায়গাতে বসে।

—সেখানে তো বসবই ফিরে এসে। আজকে তো বিরিয়ানি রাঁধবে বলেছে গণা। এতক্ষণে তার প্রস্তুতিও হয় তো শুরু হয়ে গেছে।

—শুয়োর আনল ঘাসীরাম পোর্তে শেওতারাই থেকে। শুয়োরের ভিন্ডালু খাবি যে বললি?

—সে কাল দুপুরে হবে খন। আজ তো বিরিয়ানির সঙ্গে সিনাভাজা করবে।

তারপর বলল, সরি। আমার ইচ্ছেটা জোর করে তোর উপরে চাপিয়ে দিচ্ছি। তোর কি ইচ্ছে তাই বল। কাল থেকে তুই-ই মেনু ঠিক করে দিবি। আমার জীবনে তো আগে কোনও মহিলা ছিল না। মালকিন যখন হয়েইছিস তখন এ সবের ভার তুই-ই নে।

—অমরকণ্টকে যাবি কবে? যাবি না?

—সেদিনই গিয়ে ফিরে আসতে হলে তো সকালে ব্রেকফাস্ট করেই বেরিয়ে পড়তে হয়। পোর্তে বলছিল, ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পাহাড়ি পথে অনেকখানি উঠতে হবে। মধ্যপ্রদেশের মেকলে পাহাড়ের উপরের একটা মালভূমিতে অমরকণ্টক। শোন আর নর্মদার উৎস ছাড়াও আরও একটা নদী আছে সেখানে, তার নাম কেন্।

তারপরই বলল, চা খেতে খেতে বাকি কথা হবে। যা ঘুরে আয় বাথরুম থেকে। দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর বেরুলে রাতে অমরকণ্টকেই থাকতে হবে।

—সেখানে নাকি বেশ ঠান্ডা শুনেছি। গরম কাপড়জামা তো আনিনি সঙ্গে কিছু। রাতে থাকা যাবে?

—সঙ্গে নতুন বর থাকতে আবার গরম কাপড়ের দরকার কী? আমিই তোর শীতবস্ত্র হব আর তুই আমার।

—সবতাতেই তোর অসভ্যতা। তুই সত্যিই ইনকরিজিবল।

তখনও টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। তাই বাংলোর সামনের হাতার সেই বসার জায়গাতে না গিয়ে বারান্দাতেই বসে চা খেল ওরা। ভারি ভাল দার্জিলিং চা। বিয়ের তিনদিন আগে ওরা ফ্লুরীতে চা খেতে গিয়েছিল। আসলে গেছিল মিউজিক ওয়ার্ল্ড-এ ঋতু গুহর রবীন্দ্রসঙ্গীতের আর রাশিদ খাঁ-এর সিডি কিনতে। পাশেই ফ্লুরী। নবীকৃত হবার পরে যায়ইনি। বেয়ারা বলল, কী চা খাবেন? আসাম না দার্জিলিং? দার্জিলিং চা চাওয়াতে চিকেন প্যাটিজ-এর পরে সাদা পোর্সিলিন-এর পটে এমনই সুগন্ধি চা নিয়ে এল একজন মুখ-চেনা চুল পেকে-যাওয়া বেয়ারা যে সেই চা খেয়ে আবারও এক পট করে অর্ডার করল চা ওরা।

চা খান সকলেই অভ্যাসবশে কিন্তু চায়ের ব্যাপারে সৌখিনতা বেশি মানুষের থাকে না। ঝিনুকেরও নেই। আসলে এই সব সূক্ষ্ম ব্যাপারগুলি পরিবারের মধ্যে থেকে আসে। শিশুকাল থেকে এক একটা শিশু এক একরকম পারিবারিক আবহের মধ্যে বড় হয়ে ওঠে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, রবীন্দ্রসঙ্গীত, অতুলপ্রসাদের গান, পুরাতনী গান, লেখকদের লেখা সাহিত্য, ভাল চা, সৌখিন খাওয়া-দাওয়া, ভাল ফিল্ম এবং আঁকা ছবি এ সবের মধ্যে যে শিশুর শৈশব ও কিশোর কৈশোর কাটে তার পরবর্তী জীবনে সেই আবহের প্রভাব পাকাপাকিভাবে পড়ে যায়। তার তখন ভারী কষ্ট হয় সাধারণের, চটুলদের সঙ্গে মানিয়ে নিতে। তেমন সঙ্গী পেলে সে ভাগ্যবান নইলে দশজনের মধ্যে থেকেও তাকে সবসময়ই একলাই থাকতে হয় তার একলা জগতের মধ্যে। মাঝে মাঝে খুবই কষ্ট পেতে হয় তাকে, তা ছাড়া, সেই নিতান্তই ব্যক্তিগত এবং একান্ত কষ্টের কথা অন্যে প্রায়ই বোঝে না, তাকে উন্নাসিক, আত্মম্ভরী ইত্যাদি ভাবে। তবে ঝাঁজির মামাবাড়ির প্রভাবে বিশেষ করে বড়মামা এবং মায়ের প্রভাবেই ও প্রভাবিত হয়ে এক দারুণ সৌখিন এবং জীবনমুখী মানুষ হয়ে উঠেছে।—পুরোপুরি রসিক এবং প্রখর সুরুচিসম্পন্ন। ঝিনুকও কম বেশি তাই, আর তাই তো ক্লাস ফোর থেকে ওদের সাউথ পয়েন্ট-এর কো-এড স্কুলের ক্লাসে এত মেয়ে থাকতে ঝিনুকের কথা বলা, হাঁটাচলা, হাসি, রুচি সব কিছুর মধ্যেই এমন এক সম্ভ্রান্ততা দেখেছিল ঝাঁজি যে প্রথম দেখার পরমুহূর্ত থেকেই ঝিনুকের প্রতি ও বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছে। দু'জনে দু'জনের বাড়িতে গিয়ে দুই পরিবারের আবহের মধ্যে মিল খুঁজে পেয়েছে। দু'পরিবারের সকলেই ওদের দু'জনকে ভালবেসেছেন। ভালই বেসেছেন ছেলে ও মেয়ের সহপাঠী

হিসেবে কিন্তু তখন দু'পরিবারের কেউই তো আর ভাবেননি যে তুই-তোকারি গড়ে উঠবে। প্রথম যখন ঝিনুক ওর মাকে ওর ঝাঁজির প্রতি অন্যরকম দুর্বলতার কথাটা জানায় মাত্র মাস ছয়েক আগে তখন ঝিনুকের মা শ্রুতি ঝাঁজির মাকে ফোন করে বলেন তুমি কি শুনেছ প্রতিমা কখনও যে তুই-তোকারি করতে করতে প্রেম করা যায়? এই জেনারেশনের ছেলেমেয়েগুলো এক্কেবারে যা-তা। রোম্যান্টিজম-এর কিছুমাত্র নেই ওদের মধ্যে। 'তুমি' না বলে কী করে প্রেম করা যায়? সুন্দর চিঠি না লিখে কী করে যে প্রেম প্রকাশ করা যায় তা ওরাই জানে। চিঠি-টিঠি তো উঠেই গেল। এখন তো মোবাইল আর ই-মেইল। তোমাকে বলেছে ঝিনুক কিছু?

ঝিনুকের মা প্রতিমা হেসে বলেছিলেন, আর বোলো না শ্রুতি। আমি আর প্রতীক তো হেসেই বাঁচি না ঝিনুকের কথা শুনে। বলেছিলাম, অতটুকু ছেলেকে বিয়ে করবি কি রে!

বলল, বিয়ে কি জ্যাঠামশাইকে করব? কী যে বলো মা। যে স্কুলে একদিন বন্ধু ছিল সেই যদি জীবনের সঙ্গী হয় তবে দোষ কী? ছেলেবেলা থেকে যাকে কাছ থেকে দেখেছি তার সঙ্গে অমিল হওয়ার সম্ভাবনাই তো সবচেয়ে কম।

—তোদের মন-জানাজানি হল কী করে?

ওই তো! পড়াশোনা করতে করতে, হাঁটতে হাঁটতে ফুচকা এবং পিৎজা খেতে খেতে। আমাদের স্কুলের সামনে রোজ রিকশা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা একজন রিকশাওয়ালার অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল যখন, একটা ট্যাক্সি ধাক্কা মারে তাকে, তখন ঝাঁজি তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়, রোজ ভিজিটিং আওয়ারে তাকে দেখতে যায়, ফল এবং সবচেয়ে বড় কথা ফুলও নিয়ে। শুনেছ কখনও আহত রিকশওয়ালার জন্যে কেউ ফুল নিয়ে যায় হাসপাতালে! তা ছাড়া ও যতদিন না পুরো সুস্থ হয়ে ওঠে ওর বস্তিতে গিয়ে ওর স্ত্রী ছেলে মেয়েদের নিয়মিত অর্থ সাহায্য করে। এবং সবই করে একা একা—কারোকে বলে না। আমরা বন্ধুরা জানতে পারি অনেক পরে। জানার পর থেকে অবশ্য আমরাও সকলে মিলেমিশে ওর একার ভার লাঘব করি। মনটা কত বড় হলে মানুষে এমন করতে পারে মা! নেতারা যে ক্লাসলেস সোসাইটির বুকনি ঝাড়েন, লাল, নীল, হলদে, সবুজ সব ওরাং-ওটাং নেতারাই, তাঁদের ভোট-প্রত্যাশী জনতা-দরদ নয়, ঝাঁজি সত্যিই জনদরদী। ও বলে, ও ওর বড়মামার কাছ থেকেই এই মানুষকে মানুষ জ্ঞান করার শিক্ষাটা পেয়েছে।

শ্রুতি, আমাদের কী বলার থাকতে পারে বলো। ওরা ওদেরই মতো। ওদের বুঝতে আমাদের কষ্ট হতে পারে অবশ্যই কিন্তু ওরা খুব ভাল। হয় তো আমাদের চেয়েও ভাল।

প্রতিমা বলেছিলেন দুঃখ-দুঃখ গলায়, তবে তুমি কী বলো?

আমাদের গেছে যে দিন একেবারেই কি গেছে? কিছুই কি নেই বাকি?

শ্রুতি বলেছিলেন, "রাতের সব তারাই আছে দিনের আলোর গভীরে।"

তারপর বলেছিলেন, তুমি দেখে নিও, একদিন এই মোবাইল ইন্টারনেট এ সব নিয়ে বিরক্ত হয়ে যাবে ওরা। এ সব থাকবে ব্যবসার জগতে। ব্যক্তিগত সম্পর্কে আবার আমাদের দিন ফিরে আসবে। নীল রঙা কাগজে, বলপয়েন্ট পেনও নয়, ফাউনটেইন পেন দিয়ে একজন চিঠি লিখবে আরেকজনকে, সাতনরি হার, মটরবালা ফিরে আসবে, ফিরে আসবে সুতির শাড়ি, লেস-এর ফ্রিল দেওয়া ব্লাউজ, ফিরে আসবে ভাপা ইলিশ, তেল-কই, সরপুঁটি। বোনলেস মাছের দিন যাবে। তোমার মা, মানে নীপা মামিমা সেদিন একটি রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনলেন না আমাদের? সেই গানটার সব কথা সত্যি হবে।

—কোন গানের কথা বলছ তুমি?

—অর্গান বাজিয়ে যে রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনালেন।

—সে তো অনেক গানই শুনিয়েছিলেন। মায়ের জন্মদিনে, তো?

—হ্যাঁ। হ্যাঁ।

—বিবাগী হিয়া কিসের খোঁজে বাহির পথে গেলি।
আয়, আয়রে ফিরে আয়।
পুরানো ঘরে দুয়ার দিয়া ছেঁড়া আসন মেলি।
বসিবি নিরালায়,
আয়, আয়রে ফিরে আয়।"

—ঠিক বলেছ। আশা করি তোমার এই সব ইচ্ছে নিছক উইশফুল থিংকিং হবে না। আমাদের জীবনে সত্যি হবে।

—হবে। আমার দৃঢ় ধারণা, হবে। এত জোরে রিবকের জুতো আর অ্যাডিডাসের গেঞ্জি পরে জগিং করতে করতে ওদের মুখ দিয়ে যখন ফেনা উঠবে, যখন ওরা বুঝতে পারবে, দেরি হলেও বুঝবে যে, দৌড়েরই আরেক নাম জীবন নয়, জীবন মানে থামাও, গাছের ছায়াও, পাখির ডাকও। ফ্ল্যাট, গাড়ি, পার্টি এ সবই পূর্ণ ও সুন্দর জীবনের একমাত্র পাথেয় নয়। ওরা

অবশ্যই বুঝতে পারবে একদিন যে পশ্চিমী জগতের ধ্যান-ধারণার চেয়ে আমাদের ভারতীয়ত্ব অনেক ভাল। শুধুমাত্র ব্যর্থতাই মানুষকে ফ্রাস্টেটেড করে না, সাফল্যও তা করে। বিশেষ করে আর্থিক সাফল্য। অর্থই মানুষের জীবনের একমাত্র প্রার্থনা নয়, হতে পারে না। তুমি দেখো, ওরা একদিন ঠিক বুঝতে পারবে। আর তখন জোড়ে এসে আমাদের পায়ের কাছে বসে কেউ বলবে, মা, কতদিন তোমার হাতের এলোঝেলো খাই না। অন্যে বলবে মা, যা গরম পড়েছে। কাগজি লেবুর পাতা দিয়ে একটু শুকনো লঙ্কা পোড়া দিয়ে, তেঁতুলের শরবত করে দেবে মা একটু।

প্রতিমা বললেন, তোমার সব কথাই যেন সত্যি হয়। কিন্তু আমার খুড়তুতো ভাই ওদের বিয়ের কথা শুনে একটা টিনের তোরঙ্গ কিনে কালীঘাটের পটুয়াদের দিয়ে তাতে হলুদ রঙ করিয়ে, নীল রঙা গোলাপফুল আঁকিয়ে লাল রঙে লিখে দিচ্ছে "সুখে শান্তিতে ঘর করো।"

সে কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠেছিলেন শ্রুতি।

এ সব কথাই ওরা দু'জনেই জানে। দু'জনেই জানে মায়েদের মায়ের কথোপকথনের কথা। তবে জীবনের এবং বিশেষ করে বিবাহিত জীবনের জগতে তো ওরা এই সবে সাঁতার কাটা আরম্ভ করেছে। কোন দিকে যায়, কত দূরে যায়, ঢেউ তাদের কেমন করে ভাসায় এবং নাচায় দেখাই যাক। তার পরে মায়েদের কথা যদি সত্যিই হয় তা হলে হবে। তাতেও তো তাদের আনন্দের ও জীবন উপভোগের কোনও খামতি ঘটবে না। তবে আর এ নিয়ে ভাবাভাবি কেন?

—আরেক পট চা আনতে বলি?

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পরে ঝিনুক বলল। ওরা দু'জনেই নিজের নিজের চিন্তাতে ডুবে ছিল।

—বল। আমাকে জিজ্ঞেস করছ কেন? তুমিও তো মালকিন।

বলেই বলল, আররে পোর্তে, এটা কী আনলে ট্রেতে করে?

—পেঁয়াজি সাহেব। গণা বলল, বৃষ্টি পড়ছে। নিয়ে যা, সাহেব মেমসাহেব চা-এর সঙ্গে খাবেন। কম বেসন বেশি পেঁয়াজ আর কাঁচালঙ্কা দিয়ে বানিয়েছে। খান সাহেব। গরম গরম খান।



লামনি বন-বাংলোর সামনে দিয়ে পিচ রাস্তাটা মীট্টি নালার উপরের ব্রিজ পেরিয়ে একটা বাঁক নিয়ে চলে গেছে কেঁওচির দিকে। কেঁওচি থেকে সোজা গেলে সাউথ ইস্টার্ন কোলফিল্ড লিমিটেডের কয়লা খাদান সুহাগপুর আর বাঁয়ে গেলে অমরকণ্টক। কিছু দূর যাবার পরে রেল স্টেশন পেন্ড্রা রোডে পড়বে বাঁ দিকে। যেখান থেকে পুণ্যার্থীরা মাইকাল পর্বতমালার সুউচ্চ তীর্থ অমরকণ্টকের উদ্দেশে রওনা হতেন। যে মালভূমিতে অমরকণ্টক অবস্থিত তারই নাম মেকলে হিলস। পর্বতমালা মাইকালই। মধ্যপ্রদেশে ও মহারাষ্ট্রে, বিন্ধ্যা, সাতপুরা আর লাইকান পর্বতমালা আছে। পশ্চিমঘাট। এই পর্বতদের পেরিয়ে প্রতিবছর আরব সাগর থেকে মৌসুমি বায়ু ভারতে ঢুকে বৃষ্টিবাহী মেঘ হয়ে ধীরে ধীরে পুবে এগোতে থাকে। তাই মুম্বাই পুণে গোয়া ইত্যাদি জায়গাতে বৃষ্টি আগে নামে, কলকাতাতে আসতে আসতে জুনের শেষ হয়ে যায়।

ঘাসীরাম পোর্তেই বলছিল এ সব। সাধারণ বুদ্ধি এবং ঔৎসুক্য যদি প্রবল থাকে তবে অত্যন্ত মামুলি লেখাপড়া জানা মানুষের আই কিউ-ও অনেক ডিগ্রিধারী মানুষদের চেয়ে বেশি হতে পারে। যারা পেশাদার ড্রাইভার এবং গাড়িতে নানাধরনের যাত্রী নিয়ে যারা দূর-দূরান্তে যাতায়াত করে, দেশ, সমাজ, সমাজের বিভিন্ন স্তরের দামি পোশাক পরা ভদ্র-অভদ্র মানুষদের সম্বন্ধে তাদের অভিজ্ঞতা অতি বিচিত্র হয়। সেই সব অভিজ্ঞতার মধ্যে থেকে

হাঁস যেমন জল ফেলে রেখে দুধটুকুই খায়, তেমন 'ক্ষীরম্ অম্বুমধ্যাৎ' করে তাদের মধ্যে কেউ কেউ ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে তাদের অভিজ্ঞতার সারটুকু তুলে নিতে পারে। যারা পারে, তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি সত্যিই অনেক ডিগ্রিধারীর চেয়ে বেশি ছাড়া কম হয় না। ঘাসীরাম পোর্তে সেই বিরল প্রজাতির মানুষ একজন।

বেরোবার আগে একবার শুধু মুখ ফুটে বলেছিল ঝাঁজি। সঙ্গে সঙ্গে পোর্তে দুটি ঝাড়ন, বিলাসপুর থেকে সুভাষ চৌধুরির দিয়ে দেওয়া কুরকুরের দুটি প্যাকেট, লে'জ-এর একটি প্যাকেট, দুটি কাচের গ্লাস, মিনারেল ওয়াটারের দুটি বোতল, সব একটি ব্যাগে করে নিয়ে গিয়েছে। হুইস্কির বোতলটা ঝাঁজির কাঁধে ঝোলানো ব্যাগে আছে।

ঝাঁজি শুধু বলেছিল, বড়মামার এই এক সখ ছিল। যখন বনবাংলোতে ভিড় ভাট্টা থাকত অথচ সব সঙ্গী মনোমতো থাকতেন না তখন জিপ নিয়ে জঙ্গলের গভীরে চলে যেতেন, তা সে অন্ধকার রাতই হোক কি চাঁদনি রাত, তার পর কোনও পছন্দমতো জায়গাতে জিপ থামিয়ে চুপচাপ বসে হুইস্কি খেতেন। সঙ্গে সিগার। তখন কোনও কথা বলতেন না। ঐ সময়েই বোধহয় introspection বা Contemplation করতেন।

বড়মামার দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে নববিবাহিত এবং হঠাৎ সাহসী হয়ে ওঠা ঝাঁজি বড়মামাকে অনুসরণ করবে ঠিক করেছিল আজকে। ঝিনুকের সঙ্গে তার বোঝাবুঝিতে কোনও অসুবিধে ছিল না। মানে, ভুল বোঝাবুঝির কোনও অবকাশ ছিল না।

—কত দূর যেতে হবে?

গাড়িতে ওঠার পরে এই প্রথম কথা বলল ঝাঁজি।

—বেশি না সাহেব। এই মাইল সাতেক।

তারপর?

তারপর পথের পাশে গাড়ি রেখে সিকিমাইল হেঁটে যেতে হবে।

—বৃষ্টি পড়ছে যে।

—এ বৃষ্টি কোথায়? জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেলে বড় বড় গাছগাছালির তলায় তলায় পথ, বোঝাই যাবে না বৃষ্টি।

—জন্তু-জানোয়ার নেই?

—অভয়ারণ্য যখন নাম তখন জানোয়ার তো থাকবেই সব রকমের।

—অভয় তো তাদের, আমাদের তো ভয় করতেই পারে।

—তা পারে, তবে বাবার আখড়ার ধারকাছে যারা আসে তারা সবাই নিরামিষাসী। এই হরিণ, শম্বর, গাউর, কোটরা এই সব আর কি?

—নিরামিষাসীদেরও তো বড় বড় শিং থাকে, পায়ে বড় বড় ক্ষুর থাকে। টিশোলে কী চাঁট মারলেই তো কম্ম ফতে। ফিনিশ।

—না, এরা কেউ অমন করবে না। বাবাজীর সঙ্গে নিমকহারামি করে না।

—মানে? এরা কি বাবাজীর নুন খায় নাকি?

—খায়ই তো। ওঁর এক ভক্ত শেওতারাই থেকে সপ্তাহে দু বস্তা করে নুন পাঠায়। তার ট্রান্সপোর্টের ব্যবসা—ট্রাক প্রায় রোজই সুহাগপুরের খাদান বা অমরকণ্টকে কী পেন্ড্রা রোডে যায়। সেই ট্রাকে করে পাঠিয়ে দেয়।

—অত নুন দিয়ে সাধুবাবা কী করেন?

উনি কিছু করেন না—আখড়ার পেছনে একটি ছোট্ট নালা আছে, মীট্টি নালাতে গিয়ে পড়েছে, সেই নালার পাশের দুটি জায়গাতে দুবস্তা নুন ফেলে দেন। জানোয়ারেরা সব খেতে আসে। তাই বলছিলাম যে, যার নুন খায় তার গুণ না গাইলেও তাঁর কাছে যাঁরা আসেন দিনে রাতে, তাঁদের ক্ষতি কি তারা করতে পারে?

ঝিনুক বলল, জানোয়ারেরা এমনি এমনি নুন খায়? আমরা না হয় রান্নাতে দিয়ে নয়তো পাতে খাই।

—এই নুনটা ওদের আসল খাদ্য নয়।

ঝাঁজি বলল।

—সন্ধব নুনের মতো পাথুরে নুন। প্রত্যেক জঙ্গলেই মাটিতে অথবা পাথরে ওই নুন থাকে আর তৃণভোজী জানোয়ারেরা তা চেটে চেটে খায়।

—কেন খায়?

—শুনেছি, ঘাসপাতা খেতে খেতে তাদের পেটে নাকি একরকমের পোকা জন্মায়। নুন খেলে সেই নুনে নাকি পোকারা মরে যায়। তবে এটাই বৈজ্ঞানিক কারণ কি না জানি না অবশ্য। ভাগলপুরের ভইষালোটনের জঙ্গলের এক শিকারি আমাকে বলেছিল—বড়মামার সঙ্গ যখন গেছিলাম একবার।

—কী নামটা বললি?

ভইষালোটন।

—বাঃ।

ভারি সুন্দর সুন্দর নাম আছে। আমাদের দেশের জনপদ আর নদীর নামের ভারী বাহার। একই নামও যে কত জায়গাতে আছে তা বলার নয়।

এবারে গাড়ির গতি কমিয়ে গাড়িটা আস্তে পথের বাঁ-দিকে করে পিচ রাস্তা ছেড়ে ঘাস-গজানো লাল মাটির 'সফ্‌ট শোলডার'-এ থামিয়ে দিল পোর্তে। তারপর ঝাঁজিকে বলল, সাহেব ব্যাগটা নিয়ে নিই সঙ্গে? বাবা তো কারণ বারি খান, শুকনো নেশা তো করেনই।

সিভাস রিগ্যাল-এর বোতলটা অপাত্রে অপচয় করার কোনও ইচ্ছা ছিল না ঝাঁজির। সে বলল, এটা অকারণ-বারি। বাবার পানীয় নয়। এ পানীয় অপেয়।

'অপেয়' শব্দটার মানে ঘাসীরাম পোর্তে বুঝল না। অনেক বাঙালি সাহেবও বুঝবেন না। নাই বা বুঝল।

—তুমি টর্চটা নিয়ে আগে আগে যাও।

ঝাঁজি বলল পোর্তেকে।

আকাশ পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। টর্চ লাগবে না। এতক্ষণ হেডলাইটের আলোতে চোখ বেঁধে রয়েছে তো তাই মনে হচ্ছে অন্ধকার। দু'পা হাঁটলেই ঠিক হয়ে যাবে। তারাদের আলো আছে, একফালি চাঁদও আছে।

ওরা সিংগল ফরমেশানে কিছুটা হেঁটে যেতেই দূর থেকে পুটুর পুটুর করে মানুষের কথা বল্যর আওয়াজ এল। তবে বেশি লোক নেই। মনে হল একজনই কথা বলছে—মনোলগ-এর মতো এবং হয় তো সলিলকিরও মতো। তার কথা কেউ শুনছে কি না বোঝা গেল না।

আর একটু এগোতেই ধুনির আগুন দেখা গেল গাছ-গাছালির ফাঁক ফোকর দিয়ে। খাপরাতে ছাওয়া ছোট্ট একটি আখড়া। পাশাপাশি দু'খানা ঘর, সামনে একফালি মাটির বারান্দা। ঘরের দেওয়াল ছ্যাঁচা বাঁশ আর মাটি দিয়ে তৈরি তার উপরে গোবল লেপা। ঝাঁজি দেশে আশ্চর্য হল যে সেই ঘরের দেওয়ালে নানা আদিবাসী মোটিভ আঁকা। এই অঞ্চলে বাইগা, গোন্দ আর পানকারাই থাকে। তারাই কেউ এঁকেছে হয় তো। সাধু-সন্তরা সচরাচর এমন শিষ্যভাবাপন্ন হন না।

পোর্তের সঙ্গে ওরা যখন আখড়ার সামনে উঠোনে গিয়ে দাঁড়াল তখন আগুনের আভাতে দেখল চেক চেক সাদা-কালো লুঙ্গি পরা একজন সুদেহী ভদ্রলোক একটি সস্তা ইজিচেয়ারে আধশোয়া হয়ে আছেন বারান্দাতে আর একটি অল্পবয়সী ভদ্রলোক তাঁর পায়ের কাছে মোড়া পেতে একনাগাড়ে কী

সব বলে চলেছেন। কথা বলছিলেন হিন্দিতেই উনি। পোর্তে গড় হয়ে প্রণাম করে ঝাঁজি আর ঝিনুককে দেখিয়ে বলল, ইনলোগোনে কলকাত্তাসে আয়া হ্যায় বাবা, লামনিমে ঠারহা হ্যায়।

ভদ্রলোকের বয়স কত হবে ঠিক বুঝতে পারল না ওরা। যাটও হতে পারে, আশিও হতে পারে। লুঙ্গির উপরে হাতওয়ালা গেঞ্জি। পায়ে রবারের বা প্লাস্টিকের সস্তা চটি। ইজিচেয়ারের পাশে একটি মহুয়ার বোতল এবং একটি আধভর্তি গ্লাস।

এইরকম সাধু আগে কখনও দেখেনি ওরা। পরণে গৃহীর বেশ, পাশে মহুয়ার বোতল, চুল ছোট করেই ছাঁটা তবে সম্ভবত হাজামৎ-এর অভাবে দাড়িটা গজিয়ে গিয়েছে—অযত্নে বর্ধিত কাঁচা-পাকা দাড়ি। পোর্তের সাধুবাবার মুখে বুদ্ধির দীপ্তি ঝকঝক করছে তবে দৈবী ব্যাপার কিছু আছে বলে মনে হল না।

সাধু পায়ের কাছে বসা মানুষটিকে বললেন, অন্দর সে মোড়া লাও, ইনলোগোঁকো বৈঠাও।

বলেই, কৌতুকের চোখে পরিষ্কার বাংলাতে বললেন, হানিমুনে আসা হয়েছে?

অবাক হয়ে ঝাঁজি বলল, কী করে বুঝলেন। আমার স্ত্রী তো সিঁদুর পরেনি যে অনভ্যস্ত-হাতে-পরা টিপ দেখে বুঝবেন।

ভদ্রলোক খুব জোরে হেসে উঠে বললেন! দুঃখ যেমন লুকোনো কঠিন, আনন্দও তেমন লুকোনো যায় না। আনন্দ যে মুখে-চোখে ঠিকরে বেরোচ্ছে।

ভিতর থেকে মোড়া এনে ওদের বসতে বলে বললেন, এখন তো আনন্দ সাগরে ভাসার সময়। এই চমৎকার সময়ে এই চিমসে বুড়োর কাছে আসার দুর্মতি কেন? এই ব্যাটা ঘাসীরাম পোর্তে বুঝি আমাকে দেবতা বানিয়ে আপনাদের পাকড়ে নিয়ে এসেছে? ব্যাটা একটা গবেট।

ঝাঁজি আর ঝিনুক কী বলবে ভেবে পেল না।

ঝাঁজি বলল, দেবতা নাই বা হলেন আপনি তো একজন ইন্টারেস্টিং মানুষ অবশ্যই বটে। কিন্তু এই জঙ্গলের মধ্যে একা বসে আপনি কীসের সাধনা করছেন তাই না হয় একটু জেনে যাই।

—সাধনা? তাই বলেছে বুঝি ঘাসীরাম! সাধনা-ফাধনা আমি করি না, পুজো-আচ্চাও করি না। আমার আখড়াতে কোনও দেবদেবীর বিগ্রহও নেই।

—তবে?

—তবে কী? রিটায়ার করে যে সব মানুষ সকালে উঠে ছাতা হাতে করে এ বাড়ি সে বাড়ি ঘুরে খবর দেওয়া-নেওয়া করে আগেকার দিনের ঘটকদের না নারদদের মতো, নয় তো পার্কে লাঠি-হাতে বা ছাতা-হাতে অন্য বুড়োদের সঙ্গে বসে জম্পেস করে—বউমা বা জামাই-এর নিন্দাতে পঞ্চমুখ হয়—আমি তাদের সংসর্গ এড়াতেই প্রকৃতির মধ্যে এসে রয়েছি। প্রকৃতিই আমার আরাধ্য দেবতা। প্রকৃতিই আমাদের শেষ অবলম্বন হবে। ভবিষ্যতে সব মানুষেরই আসতে হবে এখানে—আমি আর্মির অ্যাডভান্স পার্টির মতো একটু আগেই চলে এসেছি, এই যা।

চেলা—চামুণ্ডা কেউই নেই, তা হলে আপনার খাদ্য-পানীয় জোগায় কারা? চলে কী করে?

—প্রায় চলেই না বলতে গেলে। কে কী ভাবে চালায় তার উপরই তার চলা-না-চলা নির্ভর করে। বাবুয়ানি তো কিছু নেই। একচড়া খাই। আর রাতে দু-এক বোতল মহুয়া। শেওতারাইতে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে। পেনসনের চেক সেখানেই জমা পড়ে। মাসের খরচের চেক কেটে এই লামনিরই কারও না কারও হাতে দিয়ে দিই। নয় তো যারা আসে এখানে তাদের কারও হাতে। সেই টাকাতেই, মানে যে টাকা ওঠাই, তাতে দিব্যি বড়লোকের মতো চলে যায়। প্রয়োজন হচ্ছে রবারের মতো। টানলেই লম্বা হয়। তবে এ কথাও ঠিক পেনসন যদি বেশি পেতাম বা কোনও একটা লটারি-টটারি লাগাতে পারতাম তবে লামনিতে এই ঘাসীরামদের ছেলেমেয়েদের জন্যে একটা স্কুল খুলে ইংরেজিটা শেখাতাম ওদের। তবে বললাম বটে, কিন্তু লটারির টাকাতে কোনও কৌলিন্য নেই। যে টাকা মেহনত করে না কামানো যায়, সে টাকাতে ইতরামির গন্ধ লেগে থাকে।

তার পর একটু চুপ করে থেকে বললেন, ইংরেজি জানে না বলে ব্যাটারা সারাটা জীবন ঠকে মরে। এখন এ দেশে যত ঠগ-জোচ্চোর আছে সবাই ইংরেজিনবিশ। তাদের ঠকাতে না হলেও তাদের হাত থেকে বাঁচতে হলেও ইংরেজিটা একটু জানা দরকার। তা ছাড়া এখন তো ইন্টারনেট আর কম্প্যুটারের দিন এসেছে। সাহিত্য, দর্শন, অর্থনীতি, রাজ্যচালন এ সবের জন্যে যতখানি ইংরেজি জানা দরকার ততখানি ইংরেজি জানার দরকারও নেই। আমরা যেমন ইংরেজি শিখেছিলাম তেমন ইংরেজি বড় বড় শহরের নামী-দামি স্কুলেও আজকাল শেখানো হয় না। ব্যবসা করার মতো ইংরেজি

জানলেই চলবে, কেনা-বেচা করতে পারলেই হল। 'শিক্ষা' ব্যাপারটার ডেফিনিশনই তো বদলে গিয়েছে এখন। জীবনের পরমার্থ এখন শুধুমাত্রই অর্থোপার্জন। লামনির মতো জায়গাতেও এখন ব্যাটারিতে টিভি চলছে পঞ্চায়েতের ঘরে। লোভ, ধার, আর ভোগবাদের দীক্ষাতে সবাই দীক্ষিত এখন। চার্বাকই এখন সবচেয়ে বড় ফিলসফার। 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পীবেৎ'। ক্রেডিট-কার্ডই এখন ধ্রুব সত্য। তার উপরে আর সত্য নেই।

তার পর একটু থেমে বললেন, যাক গে, আপনাদের বোর করে দিলাম। আমিই তো সব বলে দিলাম, আপনারা শুনতে না চাইলেও। এবার আপনারাও কিছু বলুন।

—আমরা তো বলতে আসিনি। শুনতেই এসেছি।

ঝিনুক সাধুবাবার চেলাকে দেখিয়ে বলল, এই ভদ্রলোক কে?

—কে ভদ্রলোক?

—ওই যে। আপনার শিষ্য। যিনি আমরা আসার আগে আপনাকে একনাগাড়ে কী সব বলছিলেন।

ঝিনুকের কথাতে হেসে উঠলেন সাধু।

বললেন, ও আবার ভদ্রলোক না কি? আমি নিজে কারও গুরুও নই, ভদ্রলোকও নই, আমার কাছে যারা আসে তাদেরও কেউ ভদ্রলোক নয়। অবশ্য আপনাদের মতো কেউ কেউ কখনও সখনও এসে পড়েন। ও ব্যাটা বিলাসপুরের কলেজ থেকে ইকনমিক্স-এ ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে এম. এ. পাস করেছে। এম. ফিলও করেছে। এখন পি-এইচ. ডি.-র জন্য তৈরি হচ্ছে। ও মারাঠি। ওর নাম পাবন পান্ধে। তা ওর গাইড স্বপন সেনগুপ্ত ওকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন ওর থিসিসের খসড়াটা শুনে মতামত দেবার জন্যে। যেমন ও, তেমন ওর গাইড স্বপন। স্বপন দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে বহুদিন ছিল। আমার এক ছাত্র এখন ইকনমিক্স ডিপার্টমেন্টের ডিন হয়েছে।

—প্রফেসর সেনগুপ্ত?

ঝাঁজি চমকে উঠে বলল।

—হ্যাঁ। রামপ্রসাদ সেনগুপ্ত। ব্রিলিয়ান্ট ছেলে। ব্রিলিয়ান্ট ছেলে অনেকই দেখেছি। নিজের নিজের বিষয়ে ব্রিলিয়ান্ট অনেকেই হতে পারে কিন্তু রামপ্রসাদ একজন 'পূর্ণ মানুষ'—রবীন্দ্রনাথের ভাষাতে বললাম।

ঝাঁজি বলল, তার চেয়েও বড় কথা আদ্যোপান্ত ভাল মানুষ।

—ঠিক। ভেরি ওয়েল সেইড। তা আপনি নিজেও কি অর্থনীতির ছাত্র ছিলেন না কি?

সাধু জিজ্ঞেস করলেন ঝাঁজিকে।

—ঠিক সেরকম নয়। আমি আহমেদাবাদ-এর আইআইটি থেকে ম্যানেজমেন্টের ডিগ্রি করেছি। এখন একটি ব্যাঙ্কে কাজ করি।

—ও বাবা! আপনাদের কোয়ালিফিকেশন নিয়ে ব্যাঙ্ক-এর চাকরিই তো এখন মোক্ষ। ষাট-সত্তর হাজার টাকা দিয়ে মাইনে শুরু হয়।

—তাই? আর মামণির কী করা হয়? তোমাদের তুমিই বলছি। এই আমার দোষ। যাদের পছন্দ হয় তাদের তুমি না বলে পারি না, আর যাদের হয় না তাদের আপনি করেই বলি। যাতে সহজেই কাটিয়ে দেওয়া যায়।

ঝিনুক বলল, আমি ওর মতো পণ্ডিত নই। আমি প্রেসিডেন্সির পরে যাদবপুর থেকে ইংরেজিতে এম.এ এবং পরে বি.এড করে কলকাতার একটি স্কুলে পড়াই।

—পণ্ডিত না হওয়াই ভাল। রবীন্দ্রনাথ সেই বলেছিলেন না? যাঁহারা সব কিছুই পণ্ড করেন তাঁহারাই পণ্ডিত।

তারপর বললেন, বাঃ! তা হলে তুমি তো এখানেই চলে আসতে পারো মা। বড় বড় শহরের ছেলেমেয়েদের তো বিশেষ করে সচ্ছল পরিবারের ছেলেমেয়েদের তো অঢেল সুযোগ সুবিধা—অথচ সেখানেই সুবিধা রোজই বাড়ানো হচ্ছে, আর এত বড় দেশটার এই সব পাহাড়ে জঙ্গলে গ্রামে শিক্ষার সুযোগ আজও নেই বললেই চলে। অথচ দেশ স্বাধীন হবার পরে ষাট বছর হতে চলল। তুমি যদি আসতে রাজি থাকো তো বলো, আমি আর তুমি মিলে লামনির আদিবাসীদের জন্যে স্কুল গড়ে তুলি একটা।

ঝিনুক চুপ করে রইল।

—লজ্জা পাবার কিছু নেই মামণি। আমিও সিরিয়াসলি বলিনি তুমিও সিরিয়াসলি শোনোনি। সবে বিয়ে হয়েছে তোমাদের এখন, কত স্বপ্ন তোমাদের চোখে, কত কল্পনা। কত সাধ। সে সব মিটিয়ে তারপরই না হয় এসো। অবশ্য ততদিন আমি হয়তো বেঁচে থাকব না। সব মানুষেরই বেঁচে থাকার জন্য এক বা একাধিক স্বপ্নের প্রয়োজন। মৃত্যুর মুহূর্তে সে সেই অপূর্ণ স্বপ্নের কথা ভাবতে ভাবতেই চোখ বোঁজে।

তারপর বললেন, স্বপ্ন আমারও ছিল। না না, হানিমুনের সময়ের স্বপ্ন নয়, আমি বিয়ে করার সময়ই করে উঠতে পারিনি। আমার স্বপ্ন ছিল

নানারকম। এই দেশকে ঘিরেই। এই দেশের হতভাগ্য মানুষদের ঘিরে। সারাজীবন নোবেল-লরিয়েটদের মতো থিওরির কচকচি করে আর থিওরিটিক্যাল জ্ঞান কপচিয়েই কাটিয়ে দিলাম, কাজের কাজ কিছুই করা হল না। এ দেশ তো ইকনমিস্ট-এ গিজগিজ করে কিন্তু তাতে হলটা কী? দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার প্রকৃত উন্নতি হল না কেন? যারা বড়লোক হল বা হচ্ছে তারা দেশের ক'ভাগ?

একটু চুপ করে থেকে বললেন, রবীন্দ্রনাথের সেই গানটা আছে না?

—কোন গান?

সেই যে, 'আমি কেবলই স্বপন করেছি বপনে বাতাসে, দিনশেষে দেখি ছাই হল সব হুতাশে হুতাশে।"

তারপরই বললেন, এই দ্যাখো, তোমাদের নামই জিজ্ঞেস করা হল না।

ঝাঁজি বলল, আমার নাম ঝাঁজি সেন আর ওর নাম ঝিনুক। দাশগুপ্ত ছিল আগে।

—চারদিকেই দেখি বদ্যির চাষ। কী আর করা যাবে। তারা যে পড়াশুনাতে ভীষণই ভাল হয়। আচ্ছা, বাঙাল ছাড়া বদ্যি হয় না, না?

—সম্ভবত হয় না। তবে সেন পদবী কিন্তু পশ্চিমবঙ্গেও হয়। সেন শুধুমাত্র পূর্ববঙ্গের মানুষই হন এমন নয়।

—তাই? হবে হয় তো। তা তোমাদের নাম দুটি বেশ। ঝিনুক তো ঝাঁজির মধ্যেই থাকে। কখনও কোনও রৌদ্রালোকিত দিনে জলের তলায় ডুব দিয়ে দেখেছ ঝাঁজির রঙ কেমন নরম অথচ উজ্জ্বল সবুজ হয়? আর সেই ঝাঁজির জন্যেই তো থাকে ঝিনুক। আর ঝিনুকের মধ্যে মুক্তো।

বলেই বললেন, তোমাদের মেয়ে হলে তার নাম রেখো মুক্তো।

ওরা কথা না বলে চুপ করে রইল।

ঝাঁজি বলল, আপনার নামটা তো বললেন না?

অবাক হওয়ার ভান করে বৃদ্ধ বললেন, সে কী! মিস্টার ঘাসীরাম পোর্তে বলেনি বুঝি?

—ও তো বলেছিল বুড়াবাবা।

—ঠিকই তো বলেছিল। আমার পরিচয় দেবার মতো আর কীই বা আছে। আমি বুড়ো এবং যেহেতু আখড়া বানিয়ে থাকি তাই বুড়ো বাবা। পরিচয় দেবার মতো কিছু আমার নেই।

—পূর্বাশ্রমের কথা বলবেন না জানি। আমাদের জিজ্ঞেস করাই অন্যায় হয়েছে।

—না, না, সেরকম কিছু নয়। আমি তো সন্ন্যাসী নই, পূর্বাশ্রমের কথা বলতে আমার বাধা কোথায়? নিজের সম্বন্ধে তেমন কিছুই নেই তাই তোমরা শুনে কীইবা করবে।

হঠাৎ ঝাঁজি বলল, গাড়িতে সিভাস-রিগ্যাল হুইস্কি ছিল কিন্তু জলও আছে। আপনি কি সেবা করবেন একটু?

হো হো করে হেসে উঠলেন বৃদ্ধ। বললেন, থ্যাঙ্ক উ্য ভেরি মাচ। তবে ও তোমাদের জন্যেই রাখো। অনভ্যাসের ফোঁটাতে কপাল চড়চড় করবে।

—আনব না? আনি না।

—তোমরা যদি খাও তো তোমাদের জন্যে আনতে পারো। আমি কিন্তু খাব না। আর পাপ্পু তো টিটোটালার। ও তামাকের চুট্টা বা গাঁজার বিড়ি পর্যন্ত খায় না। মানে, ও জলেতেও নেই স্থলেতেও নেই।

বলে. হাসলেন বৃদ্ধ।

—না, আমরা খেলে পরে খাব। আপনি খেলে তবেই আনতাম।

—না বাবা ও মামণি। তোমরা খুব দয়ালু। অনেক ধন্যবাদ। মহুয়াই ঠিক আছে।

এমন সময়ে আখড়ার পিছন থেকে হঠাৎ বাঁশের জঙ্গলে খচমচ শব্দ আর বোঁয়াও করে একটা ডাক শোনা গেল। আখড়ার চারদিকেই ঘন বাঁশের জঙ্গল তবে সরু সরু বাঁশ-শহরের শৌখিন বাবুদের বাগানে যেমন থাকে।

ঝিনুক চমকে উঠে বলল, কীসের ডাক? আক্রমণ করবে না তো?

বৃদ্ধ হেসে বললেন, গাউরের বেলোয়িং-এর শব্দ। অত বড় জানোয়ার তো। হাতির পরেই আকারে তো জানোয়ার আমাদের দেশে সবচেয়ে বড়। অবশ্য গণ্ডারও কাছাকাছি যায়।

—গাউর কী?

ঝিনুক বলল।

—গাউর হল ইন্ডিয়ান বাইসন। অ্যামেরিকান বাইসনেরা এদের তুলনাতে শিশু। এদের মাথাতে সাদা লোমের হেয়ার ব্যান্ড, পায়ে হাঁটুর কাছে সাদা লোমের মোজা। প্রচণ্ড শক্তি ধরে এই জানোয়ার। দেখনি কখনও?

—কোথায় দেখব? যখন ছোট ছিলাম তখন হয়তো চিড়িয়াখানাতে দেখেছি। মনে নেই ঠিক।

—দেখতে চাও? তা হলে দাঁড়াও ঘর থেকে টর্চটা নিয়ে আসি। আখড়ার পেছনেই নুন খাচ্ছে। এদিকে ন্যাচারাল সল্টলিক তো নেই, আমিই নুন ফেলি প্রতি সপ্তাহে। শুধু গাউরই নয়, Uneulates বহু জানোয়ারই আসে। শম্বর, বারাশিঙা, চিত্রল হরিণ, কোটরা বা বার্কিং ডিয়ার। ভাল্লুক আর শুয়োরদের কখনও নুন চাটতে দেখিনি। আমি দেখিনি, তবে চাটে হয়তো, জুওলজিস্টিরাই বলতে পারবেন।

বলেই উনি ঘরে গিয়ে টর্চটা নিয়ে এসে বললেন, এসো তোমরা, আমার ঘরের পেছনে দাঁড়ালেই টর্চের আলোতে দেখতে পাবে। এটা আমেরিকান টর্চ—খুব পাওয়ারফুল। অমরকণ্টক থেকে ফেরার সময়ে এক অ্যামেরিকান ট্যুরিস্ট আমাকে উপহার দিয়েছিল।

ওরা গিয়ে একটা মস্ত গাছের নীচে দাঁড়াল। বৃদ্ধ টর্চ জ্বালিয়ে ফেললেন দু'শো গজ মতো দূরে। খুব বড় বড়, গরুর চোখের চেয়ে অনেক বড় সবুজ চোখ জ্বলে উঠল। অনেক জোড়া। বাঁশবনের মধ্যে দিয়ে যাওয়া আলো ছায়ার আঁধারি সৃষ্টি করাতে চোখগুলিকে আরও রহস্যময় দেখাচ্ছিল।

বৃদ্ধ বললেন, দেখেছ তো? ভাল করে দেখো।

ইতিমধ্যে আবারও সামনের বাঁশবনের মধ্যে খচমচ শব্দ আর বোঁয়াও শব্দ শোনা গেল।

—আজকে এতবার বেলোয়িং করছে কেন কে জানে!

স্বগতোক্তি করলেন বৃদ্ধ।

তারপর বললেন, গতকাল দিনের বেলাতে এসেছিল দলটা। দেখলাম সঙ্গে একটা বাচ্চা আছে। বয়স বোধহয় দিন সাতেক হবে। বড় বাঘে গাউর আর হাতির বাচ্চা খেতে খুব ভালবাসে। বাঘ এল কি না ওদের পায়ে পায়ে কে জানে।

—বাঘও আসে নুন খেতে?

ঝিনুক জিজ্ঞেস করল।

—বাঘ নুন খেতে আসে না। নুন যারা খেতে আসে তাদের ধরতে আসে অনেক সময়। বনের মধ্যে প্রাণীদের একদল খাদক আর অন্যদল খাদ্য।

—বাঘ যদি এসে পড়ে। আমাদের এখানে এমনভাবে নিরস্ত্র অবস্থাতে দাঁড়িয়ে থাকাটা কি ঠিক হচ্ছে? যদি আক্রমণ করে।

—কোনও ভয় নেই মামণি। বাঘ কি গাউর আমাদের কিছুই বলবে না। ওদের মধ্যে যদি কোনও কাজিয়া থাকে তবে ওরা নিজেদের মধ্যে বুঝে নেবে। আমাদের তাতে কোনও ভূমিকা নেই।

তারপর বললেন, এবারে কি ফিরে যাবে আখড়াতে?

—হ্যাঁ। হ্যাঁ। তাই চলুন।

ঝিনুকের গলার স্বরেই বোঝা গেল সে ভয় পেয়েছে।

আখড়াতে ফিরে মহুয়ার গ্লাসটা শেষ করে বোতল থেকে আরও একগ্লাস মহুয়া উনি গ্লাসে ঢেলে নিলেন যখন, তখন একটা মস্ত পোঁটলা কাঁধে নিয়ে একজন মানুষ অন্ধকার ফুঁড়ে বেরোল। সে বড় রাস্তার দিক থেকে এল।

বৃদ্ধ বললেন, কী রে! এত দেরি করলি যে।

যে ভাষাতে বললেন সেটা ঝাঁজি বা ঝিনুক বুঝতে পারল না।

গোন্দ বাইগা পানকাদের ভাষা হবে।

লোকটা কিন্তু তাদের দেখে হিন্দিতেই উত্তর দিল। বৃদ্ধ বললেন, কেঁওচির কাছে ঝড়ে একটা গাছ পড়ে রাস্তা বন্ধ ছিল অনেকক্ষণ। সুহাগপুরে থেকে খাদানের বুলডজার এসে পথ সাফ করল। তা ছাড়া, সুহাগপুরের হাট আজ লেগেওছিল দেরি করে সকালে মুকদ্দম-এর বউ মারা গেছে সাপের কামড়ে, তাই।

তার পর ওই পোঁটলা নিয়ে সে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল।

—এই হল গিয়ে আমার ম্যান ফ্রাইডে। বুঝলে! এই আমার খিদমতগারি করে। এ প্রথম পাণ্ডব। নাম যুধিষ্ঠির।

ঝিনুক বলল, আমরা তা হলে এবারে উঠি। পান্ধে মশাই-এর থিসিস পড়াতে অনেক ব্যাঘাত ঘটালাম।

বলে, ঝিনুক নিচু হয়ে বৃদ্ধের পায়ে হাত দিয়ে হঠাৎই প্রণাম করল। একটু অবাক হল ঝাঁজি। ওরা দু'জনেই একমত ছিল যে অত্যন্ত নিকট এবং বয়োজ্যেষ্ঠ আত্মীয় ছাড়া কারোরই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করার দিন আর নেই।

বৃদ্ধের মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু একটা ছিল যা ঝিনুককে প্রণাম করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। ঝিনুকের দেখাদেখি ঝাঁজিও প্রণাম করল।

প্রসন্ন মুখে সদাহাস্যময় বৃদ্ধ বললেন, তোমাদের মঙ্গল হোক। তোমাদের মধ্যে বিনয় এখনও অটুট আছে দেখছি। বিদ্যাং দদাতি বিনয়ং। সপ্রতিভতা আর দুর্বিনয়কে মানুষ এক করে দেখছে তখন। চারধারে তাই তো দেখি।

রামপ্রসাদদার মাস্টারমশাই, আপনাকে প্রণাম তো করতে হয়ই!

—পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করার মতো মানুষ দুষ্প্রাপ্য হয়ে যাচ্ছে অতি দ্রুত। তাই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম না করলেই পারতে।

—করতে ইচ্ছে করল তাই করলাম।

—তোমরা কি থাকবে লামনিতে কিছুদিন? যদি থাকো তো আবার এসো। সকালের দিকে এসো, বনের মধ্যেই কতরকমের গাছ লাগিয়েছি দেখাব। ঝুরনি নালাতে নিয়ে যাব। সে নালা গিয়ে পড়েছে মীট্টি নালাতে। বছরের এই সময়ে একরকমের হালকা বেগুনি রঙা ফুল ফোটে, জ্যাকারান্ডার মতো। নদীর দুপারে সেই ঝোপগুলো আছে। থোকা থোকা ফুল ফোটে এখন। হালকা মিষ্টি গন্ধও আছে তাতে। দিনে এলে তুলে নিয়ে গিয়ে ভায়োলেট বা লাইলাক শাড়ি পরে চুলে দিতে পারতে।

বলেই হেসে ফেলে বললেন, ফুল গোঁজার মতো চুল অবশ্য রাখোনি। আজকালকার কম মেয়েই রাখে। আমাদের সময়ে সব মেয়েদেরই বড় চুল থাকত, বড় সুন্দর দেখাত তাদের। অন্তত আমার চোখে। আধুনিকতার এবং অসুবিধার জিগির তুলে সব মেয়েই যে চুল ছোট করে ফেলল আর জিনস্ পরতে শুরু করল এর সঙ্গে প্রকৃত আধুনিকতার কতখানি সাযুজ্য আছে তা আমি জানি না। অবশ্য আমি কতটুকুই বা জানি। আমার মনে হয়, বারমুডা বা জিনস পারলেই মানুষ আধুনিক হয়ে যায় না, কী পুরুষ আর কী স্ত্রী—আধুনিকতা একটা মানসিক অবস্থান, সেটা গান্ধীজির মতো কৌপিন পরলেও থাকতে পারে আবার ব্যারিস্টার জীবনের চিত্তরঞ্জন দাশ এর মতো থ্রি-পিস স্যুট পরলেও থাকতে পারে।

ঝাঁজি বলল, অবশ্যই।

বৃদ্ধ বললেন, কয়েকটা চেরী গাছ লাগিয়েছে। কিছুদিন আগেও ফল ছিল গাছগুলোতে। পাখির মেলা বসে যায়। প্রখর গ্রীষ্মে যাতে পাখিরা চান করতে পারে তাই বেশ কয়েকটা বার্ড-বাথও করেছি। পাখিরা যখন চান করে ভয়্যারের মতো আড়াল থেকে দেখি তাদের।

বলে, নিজেই হেসে উঠলেন।

—আমরা তাহলে এগোই।

ঝাঁজি বলল।

ঝিনুক বলল, আপনার আকর্ষণেই আবার হয়তো আসতে হবে লামনিতে। দেখি, আসব হয়তো আবারও।

বৃদ্ধ বললেন, তোমাদের দেখে খুব ভাল লাগল। হানিমুনিং-কাপলরা বিশেষ দর্শনীয়। কত সাধ, আহ্লাদ, কত কল্পনা, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের জীবন নিয়ে। তার পর বললেন, এনজয় ইওরসেলভস। এক্সপ্লোর ইওরসেলভস,

এই দিনকটি জীবনে আর ফিরে আসবে না। অনেক কিছুই পাবে হয়তো পরবর্তী জীবনে কিন্তু এই দিনকটির আসামান্য দীপ্তি আর কখনওই পাবে না। বিয়ে করে যারা হানিমুনে যায় না তারা পরম মূর্খ। সত্যি বলছি, তোমাদের দু'জনকে দেখে আমার মন বড় প্রসন্নতায় ভরে গেল। তোমাদের দু'জনের শরীর মনের সব আনন্দ যেন বিকীরিত হয়ে গেল এই জঙ্গলের মধ্যের সামান্য আস্তানাতে।

—আরও কিছু বলুন আমাদের।

ঝিনুক মোহাবিষ্টের মতো বলল।

একটু চুপ করে থেকে বৃদ্ধ বললেন। যৌবনের মতো দান ঈশ্বর মানুষকে আর দেননি। যৌবনকে উপভোগ করো প্রতিমুহূর্ত। তবে যৌবন যখন থাকে তখন অন্ধ গৌরবে অনেককে অনেক মানুষ অপমান অসম্মানও করে। সেটা কোরো না কখনও। ভুলে যেও না প্রত্যেক বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদেরও একদিন যৌবন ছিল এবং তোমরা নিজেরা একদিন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা হবে। যৌবনের স্বাভাবিক ঔদ্ধত্যে যৌবন পেরিয়ে আসা মানুষদের প্রতি সহমর্মিতা হারিও না। বয়স্কদের আশীর্বাদ তোমাদের জীবনের পাথেয় হোক।

তারপর বললেন, একটা শেষ কথা বলি—গোন্দ বাইগাদের 'জোড়িদার' দম্পতির মতো জোড় লেগেছে বলেই একে অন্যকে সবসময়েই জড়িয়ে থেকো না। ছেড়ে থেও মাঝে মাঝে, মানসিক শারীরিক সব দিক দিয়ে। জানি না বোঝাতে পারলাম কি না। তোমাদের মধ্যে কেউ কি কাহলিল গিব্রান-এর 'দ্যা প্রফেট' বইটি পড়েছ?

—না।

—কলকাতাতে ফিরে গিয়েই কিনে নেবে। সেখানে উনি Spaces in between সম্বন্ধে সুন্দর করে বলেছেন। স্বেচ্ছা-বিরহই মিলনকে মধুর করে তোলে।

—মনে রাখব।

ঝাঁজি বলল। তারপর বলল, আমরা এবারে যাই।

—যাওয়া নেই এসো বাবা আর মামণি।

—চলো পোর্তে।

পোর্তে টর্চটা জ্বেলে আগে আগে চলল।

পিছনে আখড়ার আগুনের আভাও যখন অন্ধকারে মুছে গেল তখন ঝাঁজি বলল, বাবাঃ। এত জ্ঞান একসঙ্গে কি হজম হবে?

ঝিনুক বলল অসভ্যতা করিস না। আমার মনটা একেবারে ভরে গেছে। কলকাতাতে ফিরে মাকে বলতে হবে সব। কত সহজে কত দামী সব কথা বললেন বল তো?

হয়তো তাই। যাঁরা প্রকৃতই জ্ঞানী তাঁদের কাছে বোধহয় জ্ঞানটা একটা বোঝা হয়ে প্রতিপদে জানান দেয় না যে সে আছে, জ্ঞান সব দ্রবীভূত হয়ে ব্যক্তিত্বের রসায়নের মধ্যে মিশে যায়। জ্ঞানকে আর জ্ঞান বলে চেনা যায় না।

—বাঃ। দারুণ সুন্দর করে বললি তো। বাংলাটাও তো তুই অনেকের চেয়ে ভাল জানিস দেখছি। তোর কত গুণ রে!

—ইয়ার্কি করিস না। কলেজে আমাদের নিজস্ব লিটল ম্যাগ ছিল না? আমিই তো তার সম্পাদক ছিলাম। কবিতার ভাইরাস একবার মস্তিষ্ককে সংক্রামিত করলে তো সারাজীবনের মতো সংক্রামিত থাকে।

পোর্তেকে ওরা দু'জনই ধন্যবাদ দিল বুড়া-বাবার কাছে নিয়ে আসার জন্যে।

—আশ্চর্য। ভদ্রলোক নিজের পরিচয়টাই গোপন করে রাখলেন, দেখলি!

ঝিনুক বলল।

—পারবেন না। কলকাতা পৌঁছেই রামপ্রসাদকে ই-মেইল করব দিল্লিতে। পরিচয় বেরিয়ে পড়বেই। কিন্তু যতটুকু জানলাম তাইই তো যথেষ্ট। কুলজী-ঠিকুজীতে আমাদের দরকারই বা কী।



বৃষ্টি থেমে গিয়েছে। আকাশও পরিষ্কার হয়ে গেছে। শরতের আকাশের মতো হয়ে গিয়েছে। এক ফালি চাঁদ—অনেক তারা। ঝাঁজি বলল, কেঁওচির দিকে আরেকটু এগিয়ে বড় রাস্তা ছেড়ে কোনও ছোট কাঁচা রাস্তাতে গাড়ি ঢুকিয়ে এঞ্জিন বন্ধ করে কাঁচ-টাঁচ সব নামিয়ে দাও।

—এদিকে ডাকাত-টাকাত নেই তো? মধ্যপ্রদেশ বলে কথা! কী পোর্তে? বাঘ এসে পড়বে না তো!

—বাঘিনী তোর চেয়ে অনেক সুন্দরী। তোকে দেখতে বাঘের বয়েই গেছে।

না-না মেমসাহেব। অমরকন্টক কত বড় তীর্থ। আগে তো পেন্ড্রা রোডে নেমে যাত্রীরা সব পায়ে হেঁটেই যেতেন। তখন মজা ছিল আলাদা। হেঁটে না গেলে কি কিছু দেখা যায়? না কিছু ভাবা যায়!

পোর্তের কথা শুনে ওরা ভাবতে বসল।

গাড়িটা ঝাঁজির কথামতো একটা কাঁচা পথে দাঁড় করাল বুড়া-বাবার আশ্রম থেকে তিন চার কিলোমিটার গিয়ে।

ঝিনুক বলল, দ্যাখ দ্যাখ ওই তারাটা কত কাছে আর কী তাড়াতাড়ি বাঁদিক থেকে ডানদিকে যাচ্ছে।

ঝাঁজি বলল, বোকাইটা! ওটা একটা স্যাটেলাইট, তারা নয়। মানুষ খোদার উপরে যে কতরকম খোদকারীই করল। সাধারণ স্যাটেলাইটেরা

পৃথিবীর ভূতল থেকে তো খুব বেশি উপরে নেই, তাই অত উজ্জ্বল দেখাচ্ছে, আর কাছে।

তারপর ইংরেজিতে বলল, তুই খাবি নাকি একটু হুইস্কি? দাদা অ্যাটলান্টা এয়ারপোর্ট থেকে নিয়ে এসেছে। ভেজাল জিনিস নয়।

—তুই কি আমার চরিত্র নাশ করবি না কি?

—তোর সতীত্বই তো নাশ তো করে দিয়েছি। এগুলো সব ছোটখাটো আফটার এফেক্টস।

—অসভ্য কোথাকার।

—যাই বলিস আর তাই বলিস, তোর মুখে এই অসভ্য কথাটা শুনতে আমার এতই ভাল লাগে যে সত্যি সত্যিই অসভ্য হয়ে উঠতে ইচ্ছা করে।

—অসভ্য।

আবারও বলল ঝিনুক।

—একটা হুইস্কি সেজে দিল ঝিনুককে ঋাজি। নিজেরটাও নিল।

পোর্তেকে বলল, এই নাও পোর্তে, গুটখা খাও। তোমাকে দিতেই ভুলে গেছি। অচানকমারে দশরথ-এর দোকানে চা-সিঙাড়া খাওয়ার সময়ে পাশের দোকান থেকে নিয়েছিলাম।

পোর্তে খুশি হয়ে প্যাকেটটা নিল। ওকে গুটখা খেতে দেখেই চিনেছিল ঋাজি। ওদের প্রাইভেসির অসুবিধা যেন না হয় তাই, একটু দূরে গিয়ে একটা বড় পাথরের উপরে বসল পোর্তে। খুবই কনসিডারেট বলতে হবে।

ঝিনুক বলল, দেখো সাপে-খোপে না কাটে।

—নেহি মেমসাব।

হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিয়ে ঋাজি বলল, কেমন লাগছে তোর?

—কী? হুইস্কি? দুসস্ আমার এসব ভাল লাগে না। আই অ্যাম ড্রাঙ্ক উইথ লাইফ। তা ছাড়া, মা বাবা একদম পছন্দ করেন না।

—ছাড় তো। ইনভেস্টিগেট করলে বেরিয়ে পড়বে যে মেসোমশাইও হানিমুনে গিয়ে মাসিমাকে হুইস্কি খাইয়েছিলেন। দু'জনেই না খেলে ব্যাপারটা ঠিক জমে না, না?

—কী ব্যাপার?

—হোরিয়ালি।

—মানে?

—বীজ বপন। এতদিন তো কেবলই স্বপন করেছি বপন বাতাসে। এবার তোর সুন্দর শরীরে আমার বীজ বপন করব।

—তুই কি পাগল হলি? এই না ঠিক হল যে পাঁচবছর দু'জনে পাখির মতো উড়ে বেড়াব। হানিমুনে গিয়ে প্রেগন্যান্ট হয়ে ফিরব? কী ঘাস্টলি ব্যাপার!

—না রে। তাড়াতাড়ি সন্তান এলে তাদের মানুষ করার সুবিধে হয়। তারাও জীবনে তাড়াতাড়ি সেটল করে যাবে। তা ছাড়া এখন মা এবং তোর মা—মাসিমা আছেন তাঁরা ঝক্কির অনেকটাই সামলে নিতে পারবেন। একটু বড় হয়ে গেলেই তাঁদের কারও কাছে রেখেও আমরা বেড়াতে পারব। আমি সিরিয়াসলিই বলছি।

—কী জানি বাবা। আমার তো ভীষণই ভয় করছে।

—মা হওয়াই তো মেয়েদের পরম পূর্ণতা। বীজ বপন করতে হলে এমন জায়গাতেই তো করতে হয়। একটা স্বপ্নের মধ্যে অন্য একটা স্বপ্ন পূরণ হবে। ভাল করে ভেবে দ্যাখ।

—আমারটা শেষ হয়ে গেল। তোর কথাতে রীতিমতো নার্ভাস লাগছে আমার। আমাকে আরেকটা সেজে দে। দেখি মনের জোর পাই কি না!

হাসল ঝাঁজি। বলল, এই তো লক্ষ্মী সোনা বউ আমার।

বলে, ঝিনুককে আরেকটা হুইস্কি সেজে দিল ঝাঁজি। তারপর নিজেও আর একটা সেজে নিল।

বলল, আরও একটা করে খেয়ে গায়ে এবং মনে ভরপুর জোর করে চল লামনিতে ফিরে যাই। তার পর তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে আমরা খেলনা গড়ব। সাধের খেলনা।

চুপ করে রইল ঝাঁজি। ঋতুমতী হবার পরদিন থেকে কত স্বপ্ন দেখেছিল। এত তাড়াতাড়ি সেই স্বপ্নপূরণ করতে ইচ্ছে করছিল না ওর। মা হলে কি আর ও আগের মতো থাকবে? ঝাঁজিকেও কি আগের মতো ভালবাসতে পারবে? অপত্য এসে দাম্পত্যের উপরে জবরদখল নেবে না তো?

—কীরে! চুপ মেরে গেলি কেন?

—ভাবছি।

—ভাব। ভাবনার এমন জায়গা তো বেশি নেই। কনটেমপ্লেশান বল, ইনট্রোস্পেকশান বল কোনও কিছুরই এমন জায়গা আর পাবি না। ব্রাহ্মণেরা যেমন পৈতে নিয়ে দ্বিজ হয় মেয়েরাও মা হলে অন্য জীবন পায়। আমার ভীষণই উত্তেজনা হচ্ছে, যাই বল আর তাই বল।

—আমার ভয় করছে। কালকে কি আমরা সকালেই অমরকণ্টক যাব?

ঝিনুকের গালের সঙ্গে নিজের গাল ঠেকিয়ে ঝাঁজি বলল, কালকের কথা কালকে হবে। আজ রাতটা তো কাটুক স্বপ্নের রাত।

গাড়ির জানলা দিয়ে আলোছায়ার রহস্যময় বনের দিকে চেয়ে চুপ করে রইল ঝিনুক। রাতের বনে শিহরন তুলে একটা পিউ-কাঁহা পাখি বুকের মধ্যেটাতে চমক তুলে পাগলের মতো ডাকতে লাগল পিউ-কাঁহা? পিউ-কাঁহা? পিউ কাঁহা।

ঝাঁজি কথা না বলে ঝিনুককে বুকের মধ্যে টেনে নিল। শুক্লপক্ষের রাত বনের গন্ধ আর শব্দ ছড়িয়ে ক্রমশ রুপোঝুরি হয়ে উঠতে লাগল।